Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরকের ভয়াবহতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আল আমিন মোল্লা

রোলঃ 227012413

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শিরকের ভয়াবহতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আল আমিন মোল্লা

রোলঃ 227012413

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " শিরকের ভয়াবহতা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আল আমিন মোল্লা, আইডিঃ 227012413 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ শিরকের ভয়াবহতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আল-আমিন

(স্বাক্ষর)

আল আমিন মোল্লা

আইডিঃ 227012413

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

শির্ক অর্থ ও পরিচিতি 5

শিরকের প্রকারভেদ 8

শির্ক আস্গার 9

শিরক আসগারের প্রকার ও প্রকাশগুলির মধ্যে অন্যতম হলো 9

শিরকের মুলনিতি 22

ইবাদতের শিরক 26

গাইরুল্লাহর সাজদা 26

গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ জবাই মানত 27

গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা 29

ভয় ও আশার শিরক 31

হজ্জ বা যিয়ারতের শির্ক 33

শিরকের অযৌক্তিকতার বর্ননা করা 34

যিনি একমাত্র রাবব তিনিই একমাত্র ইলাহ 35

মানুষ তার দাসকে ক্ষমতার শরীক বানায় না 35

ক্ষমতা আল্লাহর কাজেই অন্যের ইবাদত কেন? 36

আল্লাহ কোনো বান্দাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি? 37

আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন নি 38

সৃষ্টির একত্ব ইবাদতের একত্ব প্রমাণ করে 40

এ সকল উপাস্য উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয় না 41

মালিককে রেখে চাকরকে মাবূদ বানানো চূড়ান্ত বোকামি 43

মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না 44

মুশরিকগণ নেককারগণের শাফা'আত পাবে না 46

অন্ধ আবেগে বিবেকের দাবি অস্বীকারের পরিণতি 47

মুর্তি, ছবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য 48
শিরকের ভয়াবহ পরিণতি 50
ভয়ঙ্করতম পাপ 50
কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না 51
শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে 52
শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ 53
মুশরিকগণের পরিচিতি ও তাদের শিরকী বিশ্বাসঃ 54
মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-কুফর 59
রুবূবিয়্যাতের শিরক 59
ক্ষমতা বিষয়ক শিরক 60
ইলম বিষয়ক শিরক 61
ওসীলা বিষয়ক শিরক 63
পীর-মাশাইখের ওসীলা 64
পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একটি ওসীলা মনে করা 65
পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একমাত্র ওসীলা মনে করা 66
পীরের কর্মকে নিজের ওসীলা বলে মনে করা 66
ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা 67
পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী মনে করা 67
মধ্যস্ততাকারীকে উলূহিয়্যাতের হক্কদার মনে করা 69
শিরকের সেকাল ও এ কাল বা বর্তমান 69
মুসলিম সমাজে শির্ক প্রবেশের প্রেক্ষাপট 74
মুসলিম সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী 74
ইহূদী ষড়যন্ত্র ও শীয়া মতবাদ 75
ঈমানের উৎসের বিচ্যুতি ও অতিভক্তি 77

শিরককে বৈধতা দানের প্রবণতা 78
সুন্নাতই নাজাতের একমাত্র সুনিশ্চিত পথ 79
শিরকের কর্ম সমূহ র বিবরন 80
প্রতিপালনের শিরক 80
প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতা 80
আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি 81
আল্লাহর ইলমুল গাইবে শিরক 82
শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ 83
শিরকের উৎস-সমূহ বন্ধ করা 85
মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা 85
ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা 86
নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা 86
ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা 87

শির্ক অর্থ ও পরিচিতি

'শিরক' শব্দটির অর্থ আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, আরবীতে শিক)شرك) অর্থ অংশীদার হওয়া । ইশরাক)إشراك(ও তাশরিক)تشريك(অর্থ অংশীদার করা বা বানানো। সাধারণভাবে 'শিরক' শব্দটিকেও আরবীতে 'অংশীদার করা' বা 'সহযোগী বানানো' অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর কোনো বিষয়ে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা বা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

আল্লাহর প্রাপ্য কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য পালন করা বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকাকে শিরক বলা হয়। এক কথায় আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অন্য কাউকে অংশী বানানোই শিরায় কুরআনের ভাষায় শিরক হলো কাউকে 'আল্লাহর সমতুল্য' করা। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ অতএব তোমরা জেনেশুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে না। (সূরা বাকারা আয়াত ২২)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِه "এবং তারা আল্লাহর সমতুল্য উদ্ভাবন করে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। " সূরা ইব্রাহিম আয়াত ৩০.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ বলেন, سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ

تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

"আমি রাসূলুল্লাহ-কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে কঠিন পাপ কী? তিনি বলেন: সবচেয়ে কঠিন পাপ এই যে, তুমি আল্লাহর সমকক্ষ বানাবে অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। " বুখারী আস সহীহ ৫/২২৩৬

এভাবে আমরা দেখছি যে কাউকে মহান আল্লাহর 'নিদ্দ' মনে করাই শিক। আরবীতে 'নিদ্দ' (এ) অর্থ সমতুল্য, মত, সমকক্ষ, তুলনীয় ইত্যাদি। কাউকে মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, আসমা, সিফাত বা ইলাহিয়্যাত-এর ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য মনে করা, অথবা আল্লাহকে যে ভক্তি প্রদর্শন করা হয় বা আল্লাহর জন্য যে ইবাদত করা হয় তা অন্য কাউকে প্রদান করা না হয়।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য: প্রথমত, কুফর ও শিরক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কাউকে কোনোভাবে কোনো বিষয়ে মহান আল্লাহর সমকক্ষ বা তুলনীয় মনে করার অর্থই তাঁর একত্বে অবিশ্বাস বা কুফরী করা। আল্লাহর তাওহীদ ও রাসূলগণের দা'ওয়াতে অবিশ্বাস না করে কেউ শিরক করতে পারে না। কাজেই শ্রিকের অর্থই তাওহীদ ও রিসালাতে অবিশ্বাস করা। অপরদিকে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ না মেনে ঈমানের কোনো রুকন অবিশ্বাস করলে তা শুধু কুফর বলে গণ্য। যেমন যদি কেউ আল্লাহর অস্তিত্বে বা তাঁর প্রতিপালনের একত্বে অবিশ্বাস করে বা মুহাম্মাদ -এর রিসালাত, খাতমুন নুবুওয়াত ইত্যাদি অস্বীকার করে তবে তা কুফর হলেও বাহ্যত তা শির্ক নয়। কারণ এরূপ ব্যক্তি সুস্পষ্ট কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে দাবি করছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরূপ কুফরের সাথেও শিক জড়িত। কারণ এরূপ ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে এ ক্ষয়িষ্ণু জড় বিশ্বকে মহান আল্লাহর মত অনাদি-অনন্ত বলে বিশ্বাস করছে, বিশ্ব পরিচালনায় প্রকৃতি বা অন্য কোনো শক্তিকে বিশ্বাস করছে।

দ্বিতীয়ত, কুফর বা অবিশ্বাসের অন্যতম প্রকাশ শিক। সাধারণভাবে যুগে যুগে অবিশ্বাসীগণ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি বা তাঁর মা'বুদিয়্যাত বা উপাস্যত্ব অস্বীকার করে কুফরী করেনি, বরং এগুলিতে তার সাথে অন্য কাউকে শরীক বা অংশীদার বলে বিশ্বাস করেই কুফরী করেছে। এজন্য কুরআন ও হাদীসে কুফরের বর্ণনায় শির্কের কথাই বেশি বলা হয়েছে।

তৃতীয়ত, মহান আল্লাহর কোনো সমকক্ষ কল্পনা করা বা শিরকের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা বুঝতে পারি যে, দুভাবে শিরক হয়ে থাকে: (১) মহান আল্লাহর কোনো সৃষ্টির প্রতি অতি-সুধারণা অথবা (২) মহান আল্লাহর প্রতি কুধারণা বা অব-ধারণা।

শিরকে নিপতিত মানুষেরা কখনো ফিরিশতা, নবী, ওলী, নেককার মানুষ, কারামত প্রাপ্ত মানুষ, তাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থান, পাহাড়, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি কোনো সৃষ্টির বিষয়ে ভক্তি ও মর্যাদা প্রদানে অতিরঞ্জন করে তাদের মধ্যে 'অলৌকিক শক্তি' বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা কল্পনা করেছে। অথবা মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণের প্রতি কুধারণা পোষণ করে তাকে সৃষ্টির মত কল্পনা করেছে এবং তাঁর সন্তান, পরিষদ, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কল্পনা করেছে।

কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত শির্ক এবং বিশ্বের বিভিন্ন জাতির শিক পর্যালোচনা করলে আমরা মূলত এ দুটি বিষয়ই দেখতে পাই। এবং এ দুটি বিষয়ও পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কারো প্রতি ভক্তির অতিরঞ্জন অর্থই আল্লাহর ক্ষমতা, রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের প্রতি কুধারণা পোষণ করা।

শিরকের প্রকারভেদ

শিরকের ভয়াবহতা অনুসারে শিরকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) শিরক আকবার অর্থাৎ বৃহত্তর শিরক বা প্রকৃত শিরক এবং (২) শিরক আসগার অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর শিরক। তাওহীদের ভিত্তিতে শিরককে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. প্রতিপালনের শিরক্ 2. নাম ও গুণাবলির শির্ক

৩. ইবাদতের শিরক

১.প্রতিপালনের শিরক্ ঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সৃষ্টি বা প্রতিপালনের বিষয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে সৃষ্টি, সংহার, প্রতিপালন, রিযক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, বিশ্ব পরিচালনা, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা।

২. নাম ও গুণাবলির শিরকঃ

মহান আল্লাহর পূর্ণতার গুণাবলি ও মহাসম্মানিত পবিত্র নামসমূহ রয়েছে। এসকল গুণ বা নামের ক্ষেত্রে কোনো সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা এ পর্যায়ের শিরক। মহান আল্লাহকে কোনোভাবে মানুষ বা সৃষ্টির সাথে তুলনা করা অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে কোনোভাবে মহান আল্লাহর সাথে তুলনীয় মনে করা এ পর্যায়ের শিরক।

৩. ইবাদতের শিরক

‘ইবাদত’-এর ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বলে বিশ্বাস করা বা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইবাদত করাকে ‘ইবাদতের শির্ক’ বলা হয়।

শির্ক আস্গার

যে বিশ্বাস, কথা বা কর্ম শিরকের মত হলেও প্রকৃত শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে নি তাকে শিরক আসগার বলা হয়। যেমন আল্লাহর ইবাদত করার ক্ষেত্রে মানুষদের থেকে প্রশংসা, সুনাম বা জাগতিক কোনো কিছু আশা করা, অথবা এমন কথা বলা যাতে বাহ্যত আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আল্লাহর সাথে তুলনীয় বলে মনে হতে পারে, যদিও বক্তার উদ্দেশ্য তা নয়।

শির্ক আসগারের ক্ষেত্রে ইবাদতকারী কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ, রুবূবিয়্যাত বা উলূহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে না, তবে তার কর্ম ও কথা এরূপ বিশ্বাসের কাছাকাছি চলে যায়। যে কোনো শিরক আসগর শিরক আকবরে পরিণত হতে পারে। কারণ মূল বিষয়টি নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও বিশ্বাসের উপরে। শিরক আসগারের বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করলে উভয় পর্যায়ের শিরকের মধ্যে পার্থক্য আরো সুস্পষ্ট হবে।

শিরক আসগারের প্রকার ও প্রকাশগুলির মধ্যে অন্যতম হলো

১.রিয়া (الرياء) অর্থ দেখানো, প্রদর্শন করা । আর আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত পালনের মধ্যে মানুষের দর্শন, প্রশংসা বা বাহবার ইচ্ছা পোষণ করাকে রিয়া বলে।

মুমিনের ইবাদত ধ্বংস করার জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ এই ‘রিয়া’। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের মধ্যে থাকবে একজন বড় আলিম, একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগিতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসগ্রস্ত হয়।

মাহমূদ ইবনু লাবীদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

“আমি সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি তোমাদের ব্যাপারে ভয় পাই তা হলো শিরক আসগার বা ক্ষুদ্রতর শিরক। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: হে আল্লাহর রাসূল, শিরক আসগার কী? তিনি বলেন: রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। কিয়ামতের দিন যখন মানুষদের তাদের কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে তখন মহান আল্লাহ এদেরকে বলবেন, তোমরা যাদের দেখাতে তাদের নিকট যাও, দেখ তাদের কাছে তোমাদের পুরস্কার পাও কি না!’মুসলিম আস সহীহ ৩/১৫১৩.

অন্য হাদীসে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ قَالَ قُلْنَا بَلَى فَقَالَ الشِّرْكُ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ

“দাজ্জালের চেয়েও যে বিষয় আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় পাই সে বিষয়টি কি তোমাদেরকে বলব না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন, বিষয়টি গোপন শির্ক। তা এই যে, একজন সালাতে দাঁড়াবে এরপর যখন দেখবে যে মানুষ তার দিকে তাকাচ্ছে তখন সে সালাত সুন্দর করবে।”ইবনু মাজাহ, আস সুনান ২/১৪০৬.

এখানে লক্ষণীয় যে, বান্দা যদি ইবাদতের ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই মনে করে, কেবল মানুষের কিছু প্রশংসা আশা করে তবে তা রিয়া বলে গণ্য হবে। আর যদি বান্দা কেবল মানুষের দেখানোর জন্যই ইবাদতটি করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্রথম পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলেও ইবাদতটি পালন করবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে বান্দা লোক না দেখলে ইবাদতটি পালনই করবে না।

২ ওসীলা-উপকরণ বিষয়ক শিরকঃ

মহান আল্লাহ এ বিশ্বের সবকছি একটি নির্ধারিত নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাকে 'সুন্নাতুল্লাহ' বলা হয়। যেমন আগুনে পোড়া, বিষে মৃত্যু হওয়া, রৌদ্রে গরম হওয়া, পানিতে ভিজলে ঠান্ডা লাগা, ঝড়ে বা প্রবল বাতাসে গাছপালা বা বাড়িঘর ভেঙ্গে যাওয়া ইত্যাদি। এরূপ কার্য-কারণ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সকলেই জানেন। মুমিন বিশ্বাস করেন যে, সব কিছুর মূল কারণ মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও দয়া। জাগতিক এ নিয়ম আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে তা কাজ করে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিয়মের কার্যকারিত স্থগিত বা নষ্ট করতে পারেন। এরূপ বিশ্বাস সহ মুমিন বলতে পারেন, বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগেছে, বৃষ্টির কারণে ফসল ভাল হয়েছে, বিষের প্রভাবে তার মৃত্যু ঘটেছে, ঝড়ের কারণে গাছগুলি ভেঙ্গে গিয়েছে, পচাবাসি খেয়ে পেট নষ্ট হয়েছে, ঔষধ খেয়ে শরীরটা ভাল লাগছে ... ইত্যাদি। এরূপ বলা কোনোরূপ অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না, যদিও মুমিন এ সকল ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহর ইচ্ছার কথা সুস্পষ্ট বলতে ভালবাসেন। তবে যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই ঔষধ রোগ সারায়, বিষ মানুষ মারে, ঝড় গাছ ভাঙ্গে বা অনুরূপ কোনো বিশ্বাস যদি তিনি পোষণ করেন তবে তা 'শিরক আকবার' বলে গণ্য হবে।

আরেক প্রকার উপকরণ-ওসীলা আছে যা জাগতিক নয়, বরং বিশ্বাসের বিষয় মাত্র। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মে যে, বিশ্বের সকল বা বিশেষ কোনো কার্যের পিছনে অমুক কারণটি বিদ্যমান। অমুক কারণটি না হলে কার্যটি হতো না। যেমন একজন খৃস্টান বলতে পারেন, যীশুর ইচ্ছায় কাজটি হয়েছে, একজন হিন্দু বলতে পারেন, অমুক দেবী বা দেবতার করণে অমুক কাজটি হয়েছে। রাশির প্রভাবে বিশ্বাসী বলতে পারেন, অমুক রাশির প্রভাবে এ কাজটি হয়েছে।

জাগতিক উপকরণ এবং বিশ্বাসের উপকরণের মাধ্যমে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। জাগতিক উপকরণাদির ক্ষেত্রে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী এবং সকল ধর্মের মানুষই একমত। কেউ যদি বলেন, খাদ্যে বিষক্রিয়ায় লোকটির পেট নষ্ট হয়েছে তবে কেউ কথাটিকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিবেন না, তবে বিশ্বাসী বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহর ইচ্ছাতেই তা ঘটেছে। পক্ষান্তরে বিশ্বাস ভিত্তিক উপকরণ-ওসীলাগুলি অন্য বিশ্বাসের মানুষের পাগলামি বলে হেসে উড়িয়ে দিবেন।

একজন মুমিন তার বিশ্বাসভিত্তিক উপকরণাদি জানা ও বলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট শিক্ষার উপর নির্ভর করবেন। জাগতিক ভাবে যা কারণ, উপকরণ বা ওসীলা নয় এবং কুরআন বা হাদীসে যাকে এরূপ উপকরণ বা কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় নি তাকে কোনো কিছুর কারণ বা উপকরণ বলে উল্লেখ করলে তা বিশ্বাসের অবস্থা অনুসারে শির্ক আকবার বা শির্ক আসগার হতে পারে।

যেমন একজন মুমিন বলতে পারেন যে, যাকাত প্রদান না করার কারণে অনাবৃষ্টি হয়েছে, ওযনে, পরিমানে কম বা ভেজাল দেওয়ার কারণে জীবনযাত্রার কাঠিন্য ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছে, ন্যায় বিচার না থাকাতে দেশের উপর বিদেশী শক্তির প্রাধান্য বেড়েছে... যিক্র-ইসতিগফারের কারণে রিযকে বরকত এসেছে, ঈমান ও তাকওয়ার প্রসারতার কারণে দেশে শান্তি ও বরকত এসেছে....। মুমিন এগুলি বলেন এবং বিশ্বাস করেন যে, এগুলি সত্যিকার কারণ ও উপকরণ-ওসীলা। কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টত এগুলিকে এ সকল বিষয়ের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু মুমিন বলতে পারেন না যে, অমুক রাশির প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে বা সুনামি হয়েছে বা অমুক রাশিতে চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণের ফলে অমুক বিষয়টি ঘটেছে। কারণ এগুলি কখনোই জাগতিক বৈজ্ঞানিক কার্যকরণের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং কুরআন-হাদীস নির্দেশিত কারণও নয়। বিশেষত প্রাচীন যুগের তারকা পূজারী বা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজারিগণ রশি বা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কথাগুলি তাদেরই কথা। যদি কেউ প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, রাশিচক্র ইত্যাদির নিজস্ব প্রভাব আছে বিশ্ব পরিচালনা ও বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সংঘটনের ক্ষেত্রে তবে তিনি শিরক আকবারে লিপ্ত প্রকৃত মুশরিক বলে গণ্য।

অনুরূপভাবে যদি কেউ মনে করেন আল্লাহর ইচ্ছাতেই এরূপ হয়, তবে আল্লাহ অমুক রাশি উপলক্ষে এরূপ করেন তবে তা শিরক আসগার পর্যায়ের কঠিন কবীরা গোনাহ বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত শিরকী কথা বলেছেন এবং আল্লাহর নেয়ামত অন্য কিছুর প্রতি আরোপ করেছেন। উপরন্তু তা আল্লাহর নামে কঠিন মিথ্যচার বলে গণ্য হবে। কারণ কখনো কোথাও অল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানান নি যে, এগুলি এরূপ বিষয়ের কারণ।

আর যদি কেউ পূর্ববর্তী ধর্মের প্রভাবে কথার মধ্যে এরূপ বলে ফেলেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন যে, এগুলির একমাত্র পরিচালক আল্লাহ, রাশিচক্র বা অনুরূপ কোনো কিছু এক্ষেত্রে কোনোরূপ দখল নেই, তবে তা 'শিরক আসগার' বলে গণ্য হবে, যা কঠিন কবীরা গোনাহ। কারণ তিনি মহান আল্লাহর দেওয়া একটি নিয়ামতকে এমন বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করেছেন যার সাথে এর কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। তিনি তার কথায় আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করেছেন।

যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন, হুদাইবিয়ায় অবস্থানকালে রাত্রিকালে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের নিয়ে সালাতুল ফাজর আদায় করেন। সালাত শেষ করে তিনি সমবেত মানুষদের দিকে মুখ করে বলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের রবব কি বলেছেন? তাঁরা বলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল উত্তম জানেন'। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

"আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ সকালে আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং কেউ আমার প্রতি কুফ্রী করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা আল্লাহর মহানুভবতা ও দয়ার কারণে বৃষ্টি পেয়েছি সে আমার প্রতি ঈমানদার এবং গ্রহনক্ষত্রের প্রতি কাফির। আর যে ব্যক্তি বলেছে, আমরা অমুক অমুক রাশির ফলে বৃষ্টি পেয়েছি তারা আমার প্রতি কুফরী করেছে এবং গ্রহনক্ষত্রে ঈমান এনেছে।"বুখারী আস সহীহ ১/২৯০.

3/ আল্লাহর সমকক্ষ ধরনের বাক্যঃ

এ পর্যায়ের শিরক আসগারের প্রকৃতি এই যে, জাগতিক বা বিশ্বাসগত কোনো প্রকৃত 'কারণ'-কে মহান আল্লাহর পাশাপাশি এমনভাবে উল্লেখ করা যাতে উভয় 'কারণ' সমান গুরুত্বের বলে মনে হয়। যেমন বৃষ্টিপাতের ফলে ফসল ভাল হওয়া একটি জাগতিক কারণ। কেউ

বলতে পারেন যে, বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় ফসল ভাল হয়েছে। তবে মুমিন বিশ্বাস করেন যে, ভাল বৃষ্টিপাত আল্লাহর ইচ্ছা ও নিয়ন্ত্রণেই হয়েছে। এক্ষেত্রে কেউ যদি বলেন 'আল্লাহর ইচ্ছা ও ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে এরূপ হয়েছে', তবে তা শিরক আসগর বলে গণ্য হবে। যদি বক্তা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা এবং বৃষ্টিপাত দুটিই স্বতন্ত্র কারণ তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনি কথাচ্ছলে এরূপ বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাতেই সবকিছু হয় তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে। কারণ তিনি বাহ্যত অন্য একটি সাধারণ কারণকে মহান আল্লাহর সমতুল্য বলে প্রকাশ করেছেন।

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে জাগতিক কোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করার কারণে উদ্ধারকৃত ব্যক্তি যদি বলে 'আল্লাহ এবং আপনি না হলে আমার বিপদ কাটত না' তবে তাও উপরের কথার মতই শিরক আকবার বা আসগার বলে গণ্য হবে।

জাগতিক-লৌকিক কোনো বিষয়ে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে বলতে পারেন 'এ বিষয়ে আপনি যা বলবেন তাই হবে,' অথবা 'আপনি যা চাইবেন তাই হবে'। যেমন বিবাহ শাদি, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি। কিন্তু তিনি যদি বলেন: 'আল্লাহ ও আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা উপরের কথাগুলির মত শিরক আসগার বা আকবার বলে গণ্য হবে। যদি কেউ বলে, 'হে আমীর, হে সম্রাট, হে মন্ত্রী মহোদয়, আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান তাই হবে' তবে তা শিরক আকবার বা আসগার। তবে তিনি যদি বলেন, ''হে সম্রাট বা আমীর, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, এবং এরপর আপিন যা ইচ্ছা করেন...'' তবে তা শিরক বলে গণ্য হবে না।

শিরক আসগার জাতীয় কথাবার্তার মধ্যে রয়েছে: আমি আল্লাহর ও আপনার উপর নির্ভর করে আছি, উপরে আল্লাহ এবং নিচে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, আমার জন্য আল্লাহ এবং আপনি ছাড়া কেউ নেই। আল্লাহ এবং আপনি না হলে কাজটি হতো না, ইত্যাদি।

এ সকল ক্ষেত্রে যদি কোউ প্রকৃতই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছার পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তির ইচ্ছারও একইরূপ প্রভাব রয়েছে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি কথার

মধ্যে অনিচ্ছাকৃত এসে যায় এবং বক্তা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর তবে তা শিরক্ আসগর বলে গণ্য হবে।

এ সকল ক্ষেত্রে অব্যয় ব্যবহারে এবং বাক্য গঠনে সতর্ক হতে শিক্ষা দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। যেমন আল্লাহর ইচ্ছাতেই হলো আর এরপর ছিল আপনার চেষ্টা ... আল্লাহর জন্যই বেঁচে গেলাম, আর এরপর ছিল আপনার অবদান ...।

৪/. 'গাইরুল্লাহ'র নামে শপথ করাঃ

যাকে মানুষ অলৌকিকভাবে পবিত্র ও অলৌকিক জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার নামে কখনো মিথ্যা বলতে সে সম্মত হয় না। কারণ সে জানে যে, এদের নাম নিয়ে মিথ্যা বললে এদের অলৌকিক আক্রোশ বা অভিশাপ তার উপর পতিত হবে। এজন্য প্রাচীন যুগ থেকে সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে শপথের সত্যতা প্রমাণ করতে এরূপ অলৌকিক পবিত্র ও ভক্তিপূত নামের শপথ করা। কারো নামে শপথ করার সুনিশ্চিত অর্থ যে শপথকারী উক্ত নামের অধিকারী সত্তাকে উলূহিয়্যাতের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে। 'গাইরুল্লাহ' বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করা মূলত শিরক আকবার। উপরের হাদীসে আমরা দেখেছি যে, 'কাবা ঘরের কসম' বা কাবাঘরের নামে শপথ করাকে শিরক বলা হয়েছে এবং কাবা ঘরের প্রতিপালকের কসম করতে বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে অনেক হাদীসে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে শপথ করতে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

তবে যদি কোনো মুমিন নও মুসলিম হওয়ার কারণে অভ্যাস অনুসারে গাইরুল্লাহর নামে শপথ করে ফেলে তবে তা 'শিরক আসগার' বলে গণ্য হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো আলিম।

৫/. অশুভ, কুযাত্রা বা অমঙ্গলে বিশ্বাস করাঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ

"অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক, অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা বা নির্ণয়ের চেষ্টা করা শির্ক।"তীরমিযী আস সুনান ৪/১৬০.

যদি কেউ বিশ্বাস করেন যে, অমুক দিবস, রাত্রি, মাস, তিথি, সময়, বস্তু, দ্রব্য বা ব্যক্তির মধ্যে শুভ বা অশুভ কোনো প্রভাবের ক্ষমতা বা এরূপ প্রভাব কাটানোর ক্ষমতা আছে তবে তা শিরক্ আকবার বলে গণ্য হবে। আর যদি এরূপ বিশ্বাস পোষণ না করেন, বরং সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভাল, মন্দ, শুভ, অশুভ সকল কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু কথাচ্ছলে এরূপ কিছু বলে ফেলেন তবে তা শিরক আসগার বলে গণ্য হবে।

৬/ জ্যোতিষ বা ভবিষ্যত ভাগ্যবক্তার কথায় বিশ্বাস করা

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। মহান আল্লাহ ছাড়া কারো ভবিষ্যতের জ্ঞান বা গাইবী জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করলে মহান আল্লাহর ইলমের বিশেষণে অন্যকে শরীক করা হয়। এজন্য ইসলামে গণক, ঠাকুর, জ্যোতিষী, রাশিবিদ, হস্তরেখাবিদ বা অনুরূপ যে কোনো প্রকারের গোপন জ্ঞানের দাবিদার বা ভবিষ্যতের জ্ঞানের দাবিদারের নিকট গমন করতে কঠিন ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ ব্যক্তির কথাকে সত্য বলে মনে করলে তা শিরক হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (ﷺ(

"যদি কেউ কোনো গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তার কথা বিশ্বাস করে তবে সে মুহাম্মাদের (ﷺ) উপর অবতীর্ণ দীনের প্রতি কুফরী করল।"আহমদ,আল মুসনাদ ২/৪২৯.

অন্য হাদীসে সাফিয়্যাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

"যদি কেউ কোনো গণক, গাইবী বিষয়ের সংবাদদাতা বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে ৪০ দিবস পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না।"মুসলিম, আস সহীহ ৪/১৭৫১.

যদি কেউ এরূপ জ্যোতিষী, গণক, রাশিবিদ, ফকীর ইত্যাদি গোপন জ্ঞানের দাবিদারকে সত্যই 'গাইবী' বা গোপন জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তবে তা শিরক আকবার বলে গণ্য। আর যদি বিশ্বাস করে যে, গোপন বা গাইবী জ্ঞান ও ভাগ্য বা ভবিষ্যতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কেউ তা জানে না বা জানতে পারে না, কিন্তু কৌতুহল বশত প্রশ্ন করে তবে তা কঠিন পাপ ও শিরক আসগর।

উল্লেখ্য বিষয় এই যে, 'ইলম দ্বারা চোর ধরা' বা অনুরূপভাবে কুরআন, বা দু'আর মাধ্যমে গাইবের কথা জানার চেষ্টা করাও 'কাহানাত' বলে গণ্য। কারো কিছু চুরি হলে তিনি চুরিকৃত দ্রব্য ফেরত পাওয়ার জন্য দু'আ-তদবীর করতে পারেন। কিন্তু কে চুরি করেছে বা চুরি কৃত

দ্রব্য কোথায় আছে তা জানার জন্য জাগতিক উপকরণ ছাড়া ‘গাইব’ জানার চেষ্টা করার কোনো সুযোগ নেই।

৭/রাশি, তাবিয ইত্যাদি ব্যবহার করাঃ

বিভিন্ন হাদীসে তাবিজ, কবজ, রশি, সূতা, তাগা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি ব্যবহার শিরক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীসে ঝাড়-ফুঁক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীসের সমন্বয়ের জন্য অনেক আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু‘আ দ্বারা যেমন ঝাড়ফুঁক বৈধ, তেমনি এরূপ আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থের দু‘আ লিখে ‘তাবিয’ আকারে ব্যবহারও বৈধ। কোনো কোনো আলিম বলেছেন যে, কুরআনের আয়াত, হাদীস বা ভাল অর্থবোধক দু‘আ দিয়ে ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তাবীজ ব্যবহার কোনোভাবেই বৈধ নয়, কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। হাদীস শরীফে কুরআনের আয়াত বা ভাল দু‘আ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দেওয়া বৈধ বলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে অনেককে ফুঁক দিয়েছেন। তবে তিনি নিজে বা তাঁর সাহাবীগণ কখনো কাউকে তাবিজ লিখে ব্যবহার করতে দিয়েছেন বলে কোনো সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। উকবা ইবনু আমির আল-জুহানী (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

“একদল মানুষ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট আগমন করেন। তিনি তাদের ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং একজনের বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি ৯ জনের বাইয়াত গ্রহণ করলেন কিন্তু একে পরিত্যাগ করলেন? তিনি বলেন, এর দেহে একটি তাবিজ আছে। তখন তিনি তার হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি তার বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং বলেন: “যে তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল।”আহমদ, আল মুসনাদ৪/১৫৬.

তাবিয়ী উরওয়া ইবনুয যুবাইর বলেন:

دَخَلَ حُذَيْفَةُ عَلَى مَرِيْضٍ فَرَأَى فِيْ عَضُدِهِ سَيْراً فَقَطَعَهُ أَو انْتَزَعَهُ ثُمَّ قَالَ: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ

"সাহাবী হুযাইফা (রাঃ) একজন অসুস্থ মানুষকে দেখতে যান। তিনি লোকটির বাজুতে একটি রশি দেখতে পান। তিনি রশিটি কেটে দেন বা টেনে ছিড়ে ফেলেন এবং বলেন[, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তারা শিরকে লিপ্ত থাকে।"আহমদ, আল মুসনাদ১/৩৮১

৮/ কাউকে 'শাহানশাহ' বলা

মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ বলা যায় না এবং যে নাম ও গুণাবলি মহান আল্লাহর জন্যই প্রযোজ্য তা অন্য কারো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা শিরক আকবার। আর কিছু নাম ও বিশেষণ রয়েছে যা জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায়।
মহান আল্লাহই এ বিশ্বের প্রকৃত মালিক, বাদশাহ ও প্রতিপালক। তবে জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মানুষদেরকে রাজা বলার অনুমতি ও প্রচলন রয়েছে। কুরআন কারীমে এরূপ ব্যবহার রয়েছে। তবে জাগতিক অর্থেও কাউকে 'রাজাগণের রাজা', 'শাহানশাহ' ইত্যাদি গালভরা উপাধিতে আখ্যায়িত করতে হাদীস শরীফে কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ (ملك الملوك)- شَاهَانْ شَاهْ- لا مَالِكَ إِلا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وفي الرواية الثانية: أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٍ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاكِ لا مَلِكَ إِلا اللَّهُ

"মহান আল্লাহর নিকট ঘৃণ্যতম নাম হলো যে কোনো মানুষ নিজেকে 'শাহানশাহ' বা 'রাজাগণের রাজা' নামে আখ্যায়িত করবে, অথচ মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো রাজা নেই। অন্য বর্ণনায়: কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও সবচেয়ে নিন্দিত হবে ঐ

ব্যক্তি যাকে 'রাজাগণের রাজা' বা 'শাহানশাহ' নামে আখ্যায়িত করা হয়, অথচ আল্লাহ ছাড়া কোনো রাজা নেই।''বুখারী, আস সহীহ ৫/২২৯২.

৯/কাউকে রব বা আব্দ বলাঃ

, জাগতিক ও আপেক্ষিক অর্থে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে 'অমুকের পালনকর্তা', মালিক বা মনিব অর্থে 'অমুকের 'রাবব' বলা যায়। অনুরূপভাবে জাগতিক দাসত্ব অর্থে একজনকে অন্যের 'আব্দ' অর্থাৎ বান্দা, দাস বা চাকর বলা যায়। তবে এরূপ শব্দ ব্যবহার না করতে হাদীস শরীফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এতে শব্দের মধ্যে শিরক হয়ে যায়, যদিও বিশ্বাসে শিরক না থাকে। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ اسْقِ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي مَوْلايَ وَلا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي-كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللَّهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللَّهِ- وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلامِي.

''তোমাদের কেউ (মালিককে 'রাবব' বলবে না), বলবে না: তোমার রাববকে খাবার দেও, তোমার রাববকে ওযূ করাও, তোমার রাববকে পানি পান করাও। বরং সে যেন (মালিককে) সাইয়েদী অর্থাৎ আমার নেতা, মাওলাইয়া অর্থাৎ আমার অভিভাবক বলে। আর তোমাদের কেউ (নিজের দাস বা চাকরকে) 'আমার বান্দা' বা আমার বান্দি বলবে না, কারণ তোমরা সকলেই তো আল্লাহর বান্দা এবং তোমাদের সকল নারীই তো আল্লাহর বান্দি। বরং বলবে: আমার যুবক বা ছেলে, আমার যুবতী বা মেয়ে বা আমার বালক।''বুখারি আস সহীহ ২/৯০১

এভাবে আমরা দেখছি যে, সাধারণ শব্দ ব্যবহারের মধ্যেও অনেক আদব ও শিরকের বিষয় রয়েছে, যা শিরক আকবার না হলেও শিরক আসগর বলে গণ্য হতে পারে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শিরক থেকে সতর্ক থাকতে এবং সর্বদা শিরক থেকে তাওবা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا نَعْلَمُ

"হে মানুষেরা, শিরক থেকে আত্মরক্ষা কর; কারণ শিরক পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্ষ্মতর। তখন একব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তা যদি পিপিলিকার পদক্ষেপের চেয়েও সুক্ষ্মতর হয় তবে কিভাবে তা থেকে আত্মরক্ষা করব? তিনি বলেন, তোমরা বলবে; হে আল্লাহ, আমরা জেনেশুনে আপনার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যা না জানি তা থেকে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

আহমদ, আল মুসনাদ ৪/৪০৩

শিরকের মুলনিতি

ইবাদত অর্থ প্রগাঢ় ভয় ও আশার সাথে কারো সামনে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করা। আমরা জানি যে, ইসলামে নবীগণ, আলিমগণ, বয়স্কগণ, নেককার মানুষগণ, পিতামাতা বা শাসক-প্রশাসককে ভালবাসতে, শ্রদ্ধা করতে ও আনুগত্য করতে নির্দেশ দিয়েছে। এদের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ করতে গেলে ভক্তি ও বিনয় আসবেই। পাশাপাশি চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া কারো সামনেই প্রকাশ করা যাবে না। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমারেখা রক্ষা করা না গেলে ইবাদতের শিরকের মধ্যে নিপতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। শিরক বিষয়ে কয়েকটি মূলনীতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো -

(১) রুবূবিয়্যাতের শিরক থেকেই ইবাদতের শিরকের উৎপত্তি। কারো মধ্যে ‘অলৌকিক’ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করলেই তার প্রতি ‘অলৌকিক’ ভক্তি প্রদর্শনের প্রবণতা জন্ম নেয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনোরূপ কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা আর কারো নেই এবং আল্লাহ কখনো কোনোভাবে কাউকে তা দেন না। শাফা‘আত, কারামাত, মুজিযা, দু‘আ কবুল সবই মহান আল্লাহর ক্ষমতা ও তাঁরই ইচ্ছাধীন। সর্বদা কুরআন ও হাদীস অর্থসহ অধ্যয়নের মাধ্যমে তাওহীদের এ বিশ্বস সুদৃঢ় করাই ইবাদতের শিরক থেকে বাঁচার উপায়।

(২) হাদীস থেকে আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ পিতামাতার দু‘আ কবুল করেন এবং আরো জানি যে, তিনি তাঁর নেককার প্রিয় বান্দাদের বা ওলীদের দু‘আ কবুল করেন। দুটি বিষয়ই হাদীসে একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কখনোই আমরা দেখব না যে, কোনো মানুষ তার পিতামাতার কাছে দু‘আর জন্য চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছে। পক্ষান্তরে একজন ‘ওলী’-র সামনে বা তার মাজারের সামনে সে ‘চূড়ান্ত ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত’ব প্রকাশ করছে। এর কারণ সে তার পিতামাতার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে জানে যে, পিতামাতার দু‘আ আল্লাহ কবুল করেন, তবে করা না করা আল্লাহ ইচ্ছ। আর ‘ওলী’র ক্ষেত্রে তার ধারণা যে তাঁর দু‘আ কবুল করা আর সেভাবে আল্লাহর ইচ্ছাধীন নেই, বরং তাঁর দু‘আ কবুল হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত। মহান আল্লাহ তাঁকে এত ভালবাসেন যে, তাঁর দু‘আ তিনি ফেলতে পারবেন না.... ইত্যদি। আর এরূপ ধারণাই শিরকের উৎস।

(৩) কে কার পিতা ও মাতা তা সকলেই সুনিশ্চিতভাবে জানে। পক্ষান্তরে কে ওলী তা কেউই সুনিশ্চিতভাবে জানে না। আমরা ইতোপূর্বে এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা আলোচনা করেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়েও এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শীয়াদের মতামত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ। তাহলে দেখুন! একজন নিশ্চিত জানেন যে, এ ব্যক্তি তার পিতা বা মাতা এবং নিশ্চিত জানেন যে, পিতা ও মাতার দু'আ আল্লাহ কবুল করেন। অথচ তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন না। অথচ তিনিই একজন মানুষকে 'ওলী' বলে ধারণা করছেন, যদিও সে ব্যক্তি সত্যই আল্লাহর ওলী কিনা তা কোনোভাবেই তিনি বলতে পারেন না, তারপর তিনি তার বিশেষ অধিকারের ধারণা করছেন এবং এ দুটি 'ধারণা'র ভিত্তিতে মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে উক্ত ব্যক্তির নিকট নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করছেন।

(৪) ভালবাসা ও ভক্তির ক্ষেত্রে ইসলামী অনুভূতি ও শিরকী অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। শিরকী বিশ্বাসে মানুষ মনে করে যে, এ ব্যক্তি 'ওলী', সাধু, 'সাই বাবা', 'অবতার' বা অনুরূপ কিছু। এ ব্যক্তি হাতে আমাদের কোনো অলৌকিক কল্যাণ বা অকল্যাণের সকল বা কিছু ক্ষমতা আছে। একে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন অথবা তার একটি বিশেষ অধিকার রয়েছে, যাতে তার সুপারিশ তিনি ফেলতে পারবেন না। তাঁকে সম্মান ও ভক্তি করে তাঁর একটু সুনজর লাভ করতে পারলেই তাঁর অলৌকিক প্রভাবে আমার বিপদ কেটে যাবে বা রোগ সেরে যাবে। আমি নেককর্ম করি বা না-করি তাঁকে ভক্তি করলে তিনি আমাকে পরকালে আমার কান্ডারী হবেন। কাজেই যেভাবে পারি, হাতে ধরে, পায়ে ধরে কোনোভাবে একে খুশি করতে পারলেই আমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

পক্ষান্তরে "ওলী"-র তা'যীমের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের চিন্তা হলো, এই ব্যক্তি আল্লাহর ভালো বান্দা। তিনি আমার মালিকের অনুগত গোলাম। আমার মালিকের গোলামিতে তিনি অগ্রসর বলেই আমি তাঁকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, যেন আমার মালিক আল্লাহ খুশি হন। আমি আল্লাহর গোলামিকে ভালবাসি। আর তাঁর গোলামিতে যে ভালো তাকেও ভালবাসি। আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে ভালবাসি। তাঁর অনুসারীকেও আমি নিঃশর্তে ও নিস্বার্থে ভালবাসি। আমার এই ভক্তি ও ভালবাসা একান্তই আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এই ব্যক্তির

কাছে আমার কোনো চাওয়া- পাওয়া নেই। কোনো ক্ষমতাও তাঁর নেই। তবে আমি জানি যে, আল্লাহর গোলামি ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণে লিপ্ত মানুষকে ভালবাসলে আল্লাহ খুশি হন, তাই ভালবাসি। এজন্য যে পদ্ধতিতে এ সকল মানুষকে ভালবাসতে ও সম্মান করতে আল্লাহ ও তাঁর মহান রাসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেই পদ্ধতিতে তাঁদের ভালবেসে ও সম্মান করে আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জন করে ধন্য হতে চাই।

(৫) ইতোপূর্বে কুরআন-হাদীসের আলোকে শিরকী কর্মগুলির বর্ণনায় আমরা ইবাদতের শিরকে প্রকারগুলি দেখেছি। আমরা দেখেছি যে, সাজদা, কুরবাণী, উৎসর্গ, জবাই, মানত, দু'আ, ডাকা, ত্রাণ প্রার্থনা করা, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা, ভালবাসা, আনুগত্য, যিয়ারত, তাবাররুক ইত্যাদি বিষয় শিরকের মূল। আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাজদা করা, উৎসর্গ, জবাই বা মানত করা, আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভাবে ডাকা বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকা ও অলৌকিক সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কারো উপর হৃদয়ের প্রগাঢ় ভয় ও ভালবাসাসহ চূড়ান্ত ভক্তিময় তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহ ছাড়া কারো নাম নিয়ে পথে বের হওয়া, নদীতে ঝাপ দেওয়া, যাত্রা শুরু করা, বাণিজ্য শুরু করা বা যে কোনোভাবে অলৌকিক নির্ভরতা ও তাওয়াক্কুল প্রকাশ করা শিরক। একইভাবে আল্লাহ ছাড়া কাউকে অলৌকিক ভয়, আশা ও ভালবাস শিরক। এছাড়া আল্লাহ ছাড়া কারো চূড়ান্ত ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য করা শিরক। যদি কেউ মনে করেন যে, পোপ, পাদরি, পীর, গুরু, সাঁই বাবা, খাজা বাবা, পিতামাতা বা অন্য কেউ যদি কোনো পাপের নির্দেশ দেয় তবে কাজটি শরীয়তে পাপ হলেও আমার জন্য তা জায়েয হয়ে যাবে, অথবা এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো নির্দেশ দেন তবে শরীয়ত বিচার না করে তা পালন করাকে জরুরী হবে, তিনি কোনো কিছুকে বৈধ বললে তা বৈধ হয়ে যাবে, তিনি যদি বলেন এখন থেকে তোমার আর অমুক ফরয ইবাদত করা লাগবে না তাহলে আমার জন্য উক্ত ইবাদতটি অনাবশ্যক হয়ে যাবে ... তাহলে নিঃসন্দেহে তা আনুগত্যের শিরক বলে গণ্য হবে।

(৬) আরবের কাফিরদের জন্য এবং ইহুদী-খৃস্টানদের জন্য যেমন তা শিরক, তেমনি মুসলিম নামধারী কেউ যদি কোনো নবী, ওলী, মাজার, কবর, স্মৃতিময় দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ কর্ম করে তবে তাও একইরূপ শিরক বলে গণ্য হবে। অজ্ঞতার কারণে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, আরবের মুশরিকগণ এ সকল ইবাদত মূতি বা প্রতিমার জন্য করত বলেই কুরআনে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। নবীগণ ও ওলীগণ তো আর অক্ষম প্রতিমা নন, বরং

তাঁর সক্ষম আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তারা সব শোনেন, দেখেন এবং সুপারিশ করেন, কাজেই তাদেরকে ডাকলে, তাদের উপর তাওয়াক্কুল করলে বা তাদের জন্য মানত করলে অসুবিধা কোথায়। কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞতার কারণেই এরূপ কথা বলা হয়। প্রথমত, যারা মূতিপূজা করেন তারা কখনোই মনে করেন না যে, মাটি বা পাথরের মুর্তিটি তাদের ডাক শোনে বা প্রয়োজন মেটায়। বরং তারা মনে করেন যে, এ মূর্তিটি যার, সে ব্যক্তির আত্মাই তাদের ডাক শোনে এবং প্রয়োজন মেটায়। শুধু তার স্মৃতি হিসেবে মূতিকে তারা সামনে রাখে। আমাদের দেশের যে কোনো হিন্দু পন্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেও তা জানতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মুর্তি ইত্যাদি জড় পদার্থের পূজা ছাড়াও আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, নবীগণ ও জিন্নগণেরও ইবাদত করত, খৃস্টানগণ ঈসা (আঃ) ও মরিয়ম (আঃ)-এর ইবাদত করত, ইহূদীগণ উযাইর (আঃ)-এর ইবাদত করত। কুরআন ও হাদীসে এদেরকে ডাকা, ত্রাণ চাওয়া, এদের জন্য মানত, জবাই, উৎসর্গ, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি কর্মকে একইভবে শিরক বলে গণ্য করা হয়েছে। উপরে ওসীলা বিষয়ক কুরআনের আয়াতে আমারা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন: "বল, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে (ইলাহ) ধারণা কর তাদেরকে আহবান কর, তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি তাদের নেই।' তারা যাদেরকে আহবান করে তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট (ওসীলা) সন্ধান করে, কে কত বেশি নিকটতর হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।"

সাহাবীগণ উল্লেখ করেছেন যে, কাফিররা যে সকল ফিরিশতা ও জিন্নদের ইবাদত করত তাদের বিষয়ে এ কথা বলা হয়েছে। এ সকল ফিরিশতা বা জিন্ন জীবিত ছিলেন, তাঁরা আল্লাহর নেক বান্দা ছিলেন, কিন্তু কুরআনে তাদের ডাকাকে শিরক বলে গণ্য করা হয়েছে এবং স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, বিপদ কাটানোর বা ত্রাণ করার কোনো ক্ষমতা তাদের নেই।

ইবাদতের শিরক

যুগে যুগে মুশরিকগণ মূলত ইবাদতের শিরকেরই বেশি লিপ্ত হয়েছে। বিভিন্ন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করেছে। বস্ত্তত মানুষের মুর্খতা ও মানবীয় দুর্বলতা তাকে প্ররোচিত করে বিপদে আপদে 'মূর্ত', 'দৃশ্যমান' বা হাতের নাগালে পাওয়া কারো কাছে অসহায়ত্ব পেশ করে বিপদ থেকে উদ্ধারের আবেদন করা। মানুষ বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে মহান আল্লাহর কাছে নিজের বিপদের কথা বলে আকুতি জানায়। কিন্তু অনেক সময় মানুষের দুর্বলতা ও অস্থিরচিত্ততা এভাবে অদৃশ্য প্রতিপালককে ডেকে তৃপ্ত হয় না। কি জানি তিনি শুনলেন তো! আমার সমস্যাটা দূর হবে তো! শয়তান এরূপ অস্থিরচিত্ততা ও দুর্বলতার সুযোগে মানুষকে প্ররেচিত করে মহান আল্লাহর ক-#; বা বস্ত্তর কাছে নিজের চূড়ান্ত ভক্তি ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করতে। বান্দা ভাবে এতে হয়ত দ্রুত তার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সে তার এরূপ কর্মকে বৈধ বলে প্রমাণ করতে চায়।

এরূপ ব্যক্তি কখনোই এ সকল ব্যক্তি বা বস্ত্তকে স্রষ্টা, প্রতিপালক বা ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে না, বরং মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণেই এ সকল ব্যক্তি বা বস্ত্তর কাছে ভক্তির অর্ঘ্য, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেন। এভাবেই ইবাদতের শিরক যুগে যুগে বিভিন্ন আসমানী ধর্মের অনুসারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে প্রসার লাভ করেছে।

কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলি মুশরিকগণ আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য পালন করত। কুরআন ও হাদীসে এগুলি একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য পালন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গাইরুল্লাহর সাজদা

সাজদা করা ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। চূড়ান্ত ভক্তি বা অলৌকিক ভক্তির প্রকাশ হিসেবেই শুধু সাজদা করা হয়। চাঁদ, সূর্য, প্রতিমা, ইত্যাদি সদকল উপাস্যকে সাজদার মাধ্যমে ইবাদত করে মুশরিকগণ। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"তোমরা সূর্যকে সাজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সাজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর।"সূরা ফুসসিলাত আয়াত ৩৭.

গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ জবাই মানত

উৎসর্গ করা (sacrifice) ইবাদতের একটি সর্বজনীন প্রকাশ। জীব জানোয়ার উৎসর্গ করা হলে আমরা সাধারণত কুরবাণী দেওয়া, বলি দেওয়া বা জবাই করা বলি। খাদ্য, ফসল, ফুল ইত্যাদী উৎসর্গ করা হলে সাধারণ ভাবে বাংলাদেশের মুসলিম পরিভাষায় মান্নত, সদকা ইত্যাদি বলা হয়। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজের মানুষেরা আল্লাহকে বা তাদের অন্যান্য উপাস্যকে খুশী করার জন্য, তাদের বর, আশীর্বাদ বা করুণা পাওয়ার জন্য বা তাদের প্রতি অন্তরের ভক্তি প্রকাশের জন্য জীব জানোয়ার, ফল-ফসল, ফুল-ফল খাদ্য ইত্যাদী উৎসর্গ করেছেন, বলি দিয়েছেন বা ভেট দিয়েছেন এবং এখনো দেন। উৎসর্গ কখনোও সাধারণভাবে করা হয়, কোন রকম শর্ত ছাড়াই একজন ভক্ত তার ভক্তির প্রকাশ হিসাবে উৎসর্গ দান করেন। কখনো বা তা মানত হিসাবে পেশ করা হয়, অর্থাৎ একজন ভক্ত উপাসক সিদ্ধান্ত নেন যে তার নির্দিষ্টমনোবাসনাপূর্ণ হলে তিনি তার উপাস্যর জন্য কিছু উৎসর্গ করবেন।

সর্ব যুগের মুশরিকদের মত আরবের মুশরিকরাও জীব জানোয়ার, ফসল খাদ্য ইত্যাদি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতো এবং তাদের অন্য সকল উপাস্যের জন্যও উৎসর্গ করত। এ শিরকের বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্য হতে তারা আল্লাহর জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ‘এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের অন্যান্য উপাস্যের জন্য। যা তাদের দেবতাদের অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের কাছে পেঁছে; তারা যা মিমাংসা করে তা নিকৃষ্ট।”সূরা আন’আম আয়াত ১৩৬.

উৎসর্গ বিষয়ক শিরকের বিষয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ

“আমি তাদেরকে যে রিযক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। শপথ আল্লাহর, তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই।” সূরা নাহল আয়াত ৫৬,

কুরবানী বা উৎসর্গ একমাত্র আল্লাহর জন্যই করার নির্দেশনা দিয়ে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

“বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ বা কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু আল্লাহরই নিমিত্ত, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক,তার কোন শরীক নেই। এজন্যই আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি সর্বাগ্রে আত্মসমর্পণ করছি।”সূরা আন'আম আয়াত ১৬২-১৬৩.

মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে সম্বোধন করে বলেন:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"তোমার প্রতিপালকের জন্য সালাত আদায় কর এবং জবাই-কুরবানী কর।" সূরা কাউসার আয়াত ২.

মুশরিকগণ মুর্তি, প্রতিমা ও গ্রহ-নক্ষত্রের করুণা ও নৈকট্য লাভের জন্য তাদের উদ্দেশ্যে জবাই করত। এজন্য তারা জবাইদের সময় তাদের নাম নিয়ে জবাই করত। অথবা তাদের উদ্দেশ্যে বানানো বিশেষ বেদি বা স্মৃতি বিজড়িত স্থানে নিয়ে পশু জবাই করত। কুরআনে তাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া তারা তাদের উপাস্যদের করুণা লাভের উদ্দেশ্যে তাদের নামে পশু ছেড়ে দিত। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

"বাহীরাহ, সায়িবা, ওয়সীলাহ ও হাম (উপাস্যদের নামে বিভিন্ন প্রকারের উৎসর্গকৃত পশু) আল্লাহ স্থির করেন নি; কিন্তু কাফিরগণ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না।"

হাজ্জাজুল্লাহিল বালিগাহ১/১৮৭.

গাইরুল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বা নির্ভরতা

তাওয়াক্কুল অর্থ নির্ভরতা । নির্ভরতা বলতে লৌকিক ও অলৌকিক দু প্রকারেরই হতে পারে। জাগতিকভাবে একজন মানুষ অন্যের শক্তি, ক্ষমতা, সহযোগিতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করতে পারে। এক্ষেত্রে নির্ভরকারী ব্যক্তি নির্ভরকৃত ব্যক্তির মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব বা অপার্থিবত্ব

কল্পনা করে না, বরং স্বাভাবিক মানবীয় আস্থা বা নির্ভরতা প্রকাশ করে। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ নির্ভরতা প্রকাশ করে।

অলৌকিক নির্ভরতা কোনো অবিশ্বাসী বা নাস্তিক মানুষ করেন না। কেবলমাত্র বিশ্বাসী মানুষ যে ব্যক্তি বা সত্তার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা বা জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অপার্থিব বা অলৌকিকভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ করার বা তা রোধ করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করে তার অলৌকিক সাহায্য ও করুণার উপর নির্ভর করে। মনের এরূপ প্রগাঢ় নির্ভরতাকেই ইসলামী পরিভাষায় তাওয়াক্কুল বলা হয়।

মানুষ যার বা যাদের উপাসনা করে, অন্তরের গভীরে তার বা তাদের অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের আশা করে এবং এই সাহায্যের উপর তার নির্ভরতা থাকে। সে তার উপস্যের নাম নিয়ে বা তার উপাস্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে তার কর্ম শুরু করে। এই নির্ভরতা এক প্রকার ইবাদত। কেউ যদি কারো নাম নিয়ে বা কারো অতিপ্রাকৃতিক সাহায্য ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর অন্তরের আস্থা বা নির্ভরতা নিয়ে কর্ম শুরু করেন, তাহলে তিনি তার উপাসক হিসাবে গণ্য হবেন। এজন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপর তাওয়াক্কুল করা, কারো নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করা, কারো নামে পাড়ি জমানো... ইত্যাদি শিরক। কুরআন কারীমে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করতে বা তাওয়াক্কুল করতে বার বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

‘‘আর মুমিনগণ একমাত্র আল্লাহর উপরেই নির্ভর করুক।’’সূরা আলে ইমরান আয়াত ১২২.

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلا

"এবং আপনি আল্লাহর উপরে নির্ভর করুন, উকিল বা কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।"সূরা নিসা আয়াত ৮১

অন্যত্র বলা হয়েছে:

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ

"তোমরা যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী হও তবে শুধু তারই উপরে নির্ভর কর।"সূরা ইউনুস আয়াত ৮৪.

আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

"বল, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই, আমি একমাত্র তার উপরেই নির্ভর (তাওয়াক্কুল) করেছি এবং তার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।"সূরা রাদ আয়াত ৩০.

ভয় ও আশার শিরক

তাওয়াক্কুল-এর সাথে সম্পৃক্ত ইবাদত আশা ও ভয়। তাওয়াক্কুলের ন্যায় ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা দুই প্রকারের: প্রাকৃতিক বা বৈষয়িক ও অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক। সাধারণ প্রাকৃতিক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসার সৃষ্টি হয় দুনিয়ার জীবনের বিভিন্ন বস্তুগত ও বৈষয়িক কারণে। আমরা হিংস্র বা বিষাক্ত জীব, ধারাল অস্ত্র, জালিম মানুষ ইত্যাদি দেখলে ভয় পাই।

পার্থিব জীবনে একে অপরের বিভিন্ন ধরণের উপকারর আশা করি। এ ধরণের পার্থিব ও বৈষযিক ভয়-ভীতি বা আশা-ভরসা মানুষ ও মানবেতর জীব জানোয়ারের মধ্যে বিরাজমান এবং তা ইবাদতের মধ্যে গণ্য নয়। এরূপ ভয় বা আশা কোনো ‘বিশ্বাসের’ সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং ‘মানবীয় প্রকৃতির’ সাথে সম্পৃক্ত। নাস্তিক, আস্তিক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী সকলেই এরূপ ভয় ও আশা করেন।

পক্ষান্তরে মানুষ যখন কোন ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তিকে ‘চূড়ান্ত বা অলৌকিকভাবে ভক্তি করে’ অর্থাৎ ইবাদত করে, স্বাভাবিক মানবীয় বা প্রাকৃতিক শক্তির ঊর্ধ্বে তাকে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, তিনি অতিপ্রাকৃতিক শক্তির অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলেই জাগতিক উপকরণ ছাড়াই অলৌকিকভাবে কল্যাণ বা অকল্যাণ, উপকার বা ক্ষতি করতে পারেন, তখন ঐ মানুষের মনে ঐ ব্যক্তি, সত্তা বা শক্তির প্রতি ভয় ও আশার সঞ্চার হয়। এরূপ ভয় বা আশার ভিত্তি ‘বিশ্বাস’। যে যাকে অলৌকিক শক্তিময় বলে বিশ্বাস করেন তাকেই এরূপ ভয় করেন বা তার অলৌকিক সাহায্যের আশা করেন। এজন্যই একজন মানুষ একটি মাটির ঢিলার মতই বিনা দ্বিধায় একটি মুর্তি, কবর বা উপাসনালয় একজন ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, পক্ষান্তরে অন্য একজন মানুষ উক্ত মুর্তি, কবর বা উপাসনালয়ে প্রতি সামান্যতম অভক্তির কথা কল্পনা করতেও ভয় পান।

এই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ভয়-ভীতি ও আশা-ভরসা ইবাদত বলে গণ্য, যা একমাত্র আল্লাহর নিমিত্ত নির্ধানিত। মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

এবং তোমরা কেবলমাত্র আমাকেই ভয় কর।”সূরা বাকারা আয়াত ৪০.

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে এবং তারা ছিল আমার নিকট বিনীত।"সূরা আম্বিয়া আয়াত ৯০.

হজ্জ বা যিয়ারতের শির্ক

হজ্জ ইসলামের অন্যতম ইবাদত। ইবরাহীম (আঃ)-এর সময় থেকে আরবের মানুষদের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাবাগৃহের হজ্জ আদায়ের রীতি প্রচলিত ছিল। পরবর্তী যুগে যখন শিরকের প্রসার ঘটে তখন কাবাগৃহের হজ্জ ছাড়াও বিভিন্ন উপাস্যের সন্তুষ্টি, আশীর্বাদ, বর বা বরকত লাভের জন্য মুশরিকগণ আরো অনেক 'পবিত্র' স্থানে গমন করত বলে হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। এগুলির মধ্যে ছিল ইয়ামানের 'রিয়াম' নামক মন্দির এবং খাস'আমদের 'যুল খুলাইসা' নামক মন্দির।

মুশরিকদের একপ্রকার শির্ক ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য হজ্জ। এর স্বরূপ এই যে, এরূপ মুশরিকগণ তাদের 'উপাস্য-শরীকদের' স্মৃতি বিজড়িত বিশেষ কিছু স্থানকে বরকতময় বলে বিশ্বাস করে এবং সে সকল স্থানে গমন ও অবস্থান এ সকল শরীকের নৈকট্য ও দয়া লাভের উপায় বলে বিশ্বাস করে। ইসলামী শরীয়তে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন

لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ (ﷺ) وَمَسْجِدِ الأَقْصَى (مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي)

"তিনটি মাসজিদ ছাড়া কোথাও সফরে যাওয়া যাবে না: মাসজিদুল হারাম, আমার মাসজিদ (মাসজিদে নববী) ও মাসজিদুল আকসা।"হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ১/১৮৮.

শিরকের অযৌক্তিকতার বর্ননা করা

কুরআন কারীমের প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই বিভিন্নভাবে মুশরিকদের বিভ্রান্তি খন্ডন করা হয়েছে এবং তাদের কর্মের অযৌক্তিকতা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

কুরআনে অধিকাংশক্ষেত্রে দু শ্রেণীর মুশরিকের আকীদা খন্ডন করা হয়েছে: (১) আরবের মুশরিকগণ এবং (২) ইহূদী-খৃস্টানগণ।

প্রথম দলের মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করত যে, মহান আল্লাহই একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম মালিক এবং তিনি কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ফয়সালা দিলে তা রোধ করার ক্ষমতা কোনো উপাস্যেরই নেই। তবে সাধারণ অবস্থাতে এরা কিছু কল্যাণের ক্ষমতা রাখে যে ক্ষমতা তাদেরকে আল্লাহই ভালবেসে দিয়েছেন। এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং এদের সুপারিশ আল্লাহ ফেলেন না।

এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা ফিরিশতা, জিন্ন, পূর্ববর্তী কোনো কোনো নবী-রাসূল এবং অনেক প্রতিমা-মুর্তি ও প্রতিকৃতির ইবাদত করত।

দ্বিতীয় দলের মানুষেরাও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করত। খৃস্টানগণ ঈসা (আঃ)-এর বিষয়ে বিভিন্ন অতিভক্তিমূলক বিশ্বাসের কারণে শিরক করত। এছাড়া মরিয়ম (আঃ)-এর ও ইবাদত করত। উপরন্তু অনেক সাধু, সেন্ট বা সান্তার ভক্তির নামে তারা তাদের ইবাদত করত।

এদের শিরকের অযৌক্তিকতা বর্ণনায় কুরআনের যুক্তির মধ্যে রয়েছে:

যিনি একমাত্র রাবব তিনিই একমাত্র ইলাহ

রুবূবিয়্যাত যেহেতু একমাত্র আল্লাহর সেহেতু অন্যের ইবাদত একেবারেই অযৌক্তিক। যার মধ্যে চূড়ান্ত রুবূবিয়্যাতের বা প্রতিপালন, সংহার, সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষমতা নেই তার নিকট চূড়ান্ত ভক্তি বা বিনয় প্রকাশের মত পাগলামি আর কি হতে পারে।

মুশরিকদের সকল উপাস্যের ক্ষেত্রেই এ বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, ফিরিশতা, নবী, ওলী, জিন্ন বা অন্য সকলের ক্ষেত্রেই মুশরিকগণ একবাক্যে স্বীকার করত যে, এরা কেউ স্রষ্টা নন, একটি মাছিও এদের কেউ সৃষ্টি করেন নি এবং সৃষ্টি ও প্রতিপালনের একক ক্ষমতা আল্লাহরই।

মানুষ তার দাসকে ক্ষমতার শরীক বানায় না

কোথাও কোথাও মানবীয় যুক্তিতেই তাদের দাবির অসারতা ফুটিয়ে তুলা হয়েছে। মুশরিকগণও স্বীকার করে এবং করত যে, যাদের তারা ডাকে তারা আল্লাহর বান্দা ও আল্লাহর মালিকানাধীন, তবে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, ফলে তারা আল্লাহর মাহবূব, প্রিয় বা ওলী। কাজেই মহান আল্লাহ তাঁর অলৌকিক বিশ্বপরিচালনা শক্তি তাদেরকে দান করেছেন।

মহান আল্লাহ জানিয়েছেন, তাদের এ চিন্তাটিই মূলত অসার, অলীক ও অযৌক্তিক। আল্লাহর প্রিয়গণ বা মাহবূবগণ তার চাকর। একজন মানুষ বন্ধুর সাথে অন্য মানুষ বন্ধুর যে সম্পর্ক এখানে সেরূপ সম্পর্ক নয়। বরং একজন ভাল চাকরের সাথে একজন মালিকের যে সম্পর্ক এখানে সেরূপ সম্পর্ক। মালিক চাকরকে ভালবাসতে পারে, কিন্তু নিজের সম্পদের মালিকানা বা অধিকার দিবে কেন?

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“আল্লাহ রিযকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারো উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের রিযক বণ্টন করে দেয় না যে তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?”সূরা নাহল আয়াত ৭১

মানুষ নিজেই যখন নিজের কোনো ক্রীতদাসকে নিজের সম্পত্তির বা ক্ষমতার শরীক করে না, তখন কেন আল্লাহ সর্বশক্তিমান তার কোনো সৃষ্ট দাসকে তার শরীক বানাবেন? যাদেরকে আল্লাহর বদলে ডাকা হয় তাদের ক্ষমতা ও অধিকার যদি আল্লাহর ইচ্ছাধীনই হয় তবে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ডাকার দরকার কি?

ক্ষমতা আল্লাহর কাজেই অন্যের ইবাদত কেন?

যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া হতো যে, মহান আল্লাহ প্রতিপালনক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান হলেও অন্য কারো কারো অল্প সল্প কিছু ক্ষমতা আছে তবুও যুক্তির দাবি হত যে, তাদেরকে বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কোনোরূপ অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আর যাদের কোনো ক্ষমতা নেই তাদের ইবাদত করা বা তাদের কাছে ভয়-ভক্তি মিশ্রিত চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও বিনয় প্রকাশ করার চেয়ে পাগলামি আর কিছুই হতে পারে না। এ বিষয়ক অনেক আয়াত আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ তা নিবারণ করতে পারে না এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে তা উন্মুক্ত করার মতও কেউ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”সূরা ফাতির আয়াত ২.

আল্লাহ কোনো বান্দাকে ক্ষমতা দিয়েছেন তার প্রমাণ কি?

আমরা দেখেছি যে, কাফিরগণ সবকিছু স্বীকার করার পরেও দাবি করত যে, মহান আল্লাহ এদেরকে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এদের ইবাদতে খুশি হয়ে তিনি এদেরকে কিছু ক্ষমতা-অধিকার দিয়েছেন, যেমন রাজা-মহারাজা তার প্রিয় খাদেম বা দাসকে অনেক সময় খুশি হয়ে আঞ্চলিক শাসক বানিয়ে দেন বা কিছু ক্ষমতা দিয়ে দেন। কুরআন কারীমের বিভিন্নভাবে কাফিরদের এ দাবির অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

কোথাও তাদের কাছে দলিল চাওয়া হয়েছে, তোমরা ওহীর আয়াত থেকে প্রমাণ দেখাও, কবে, কোথায় কোন্ ফিরিশতা, নবী, ওলী বা ব্যক্তিকে আল্লাহ কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন? এ বিষয়ক কিছু আয়াত আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি। এ অর্থের এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমন্ডলীতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব আছে কি? পূর্ববর্তী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরগত কোনো জ্ঞান থাকলে তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।''সূরা আহকাফ আয়াত ৪.

স্বভাবতই তারা এরূপ কোনো দলিল উপস্থাপনের অক্ষম ছিল। এক্ষেত্রে তারা অমুক বলেছেন, সমাজের সকলেই বলে, সকলেই করে, পিতাপিতামহগণ করেছেন ইত্যাদিকে দলিল হিসেবে পেশ করত। এমনকি খৃস্টানগণও কখনো তাদের প্রচলিত বাইবেল থেকে একটি দ্ব্যর্থহীন দলিলও পেশ করতে পারে নি, যাতে ঈসা মসীহ (আঃ) বলেছেন যে, তোমরা আমার ইবাদত করবে, বা আল্লাহকে পেতে হলে আমার ইবাদত করতে হবে, অথবা আমার মধ্যকার যে

পুত্রসত্তা আছে তোমরা তার ইবাদত করবে। তিনি সর্বদা একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের কথা বলেছেন।

আল্লাহ কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা প্রদান করেন নি

অন্যত্র মহান আল্লাহ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কখনোই কাউকে এরূপভাবে ক্ষমতা দেন নি। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

''বল, 'প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁরা ক্ষমতায়-রাজত্বে কোনো শরীক নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে- কারণে তাঁর অভিভাবকের বা সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।''সূরা বনি ইসরায়েল আায়াত ১১১.

এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ

''বল, 'তোমরা আহবান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে (ইলাহ) মনে করতে, তারা আকাশ-মন্ডলী এবং পৃথিবীতে অণুপরিমাণ কিছুর মালিক নয় এবং এতদুভয়ে তাদের কোনো অংশও নেই এবং তাদের কেউ মহান আল্লাহর সহায়কও নয়।''সূরা সাবা আয়াত ২২.

এ বিষয়টি সকল মুশরিকের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, তারকা, ফিরিশতাগণ, নবীগণ, ওলীগণ, জিন্নগণ বা অন্য যাদেরই ইবাদত করত মুশরিকগণ সকলের ক্ষেত্রেই উত্তর একই। তাঁরা কেউই আসমানের বা যমিনের এক অনুপরিমাণ মালিকানা রাখেন না। আসমান-যমিনের কোথাও তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই এবং মহান আল্লাহ তাদের কারো সহযোগিতার প্রত্যাশী নন, কেউ তাকে কোনোরূপে সাহায্য সহযোগিতা করেন না। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ

“তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। রাজত্ব-মালিকানা তাঁরই। এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়।”সূরা ফাতির আয়াত ১৩.

খৃস্টানগণ ঈসা মাসীহ (আঃ)-কে মহান আল্লাহর যাত বা সত্তার অংশ ও ‘অবতার’ হিসেবে ইবাদত করে। এ ছাড়া তারা মরিয়ম (আঃ)-কে ‘সান্তা’ বা মহান আল্লাহর বিশেষ করুণাপ্রাপ্ত ‘ওলী’ হিসেবে ইবাদত করে। তার মুর্তিতে বা ফিলিস্তিনে বিদ্যমান তার কবরে সাজদা করে, মানত করে, তার আশীর্বাদ ও বর প্রার্থনা করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে বিশ্ব পরিচালনায় কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন বলে তারা বিশ্বাস করে। মহান আল্লাহ তাদের মানবত্ব ও অক্ষমতা বর্ণনা করে বলেন:

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“মরিয়ম-তনয় মাসীহ তো কেবল একজন রাসূল; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তারা উভয়ে খাদ্যাহার করত। দেখ, তাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি, আরো দেখ, তারা কিভাবে সত্য বিমুখ হয়! বল, ‘তোমরা কি আল্লাহ

ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার কোনোই ক্ষমতা নেই তোমাদের ক্ষতি করার বা উপকার করার? আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”সূরা মায়িদা আয়াত৭৫-৭৬.

সৃষ্টির একত্ব ইবাদতের একত্ব প্রমাণ করে

ক্ষমতার বিষয়টি মুশরিকদের মধ্যে এমনভাবে আসন গেড়েছিল যে, সবকিছুর পরেও তারা দাবি করত আমাদের উপাস্যদের কিছু ক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছেন। এজন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টির একত্বের বিষয়টি উল্লেখ করে বারংবার বলেছেন যে, যারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না তাদের তো কোনো ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা থাকতে পারে না। তাদের কোনো ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় কোনো ভাবেই তারা মহান আল্লাহর সমকক্ষ হতে পারে না। কাজেই কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডাকতে হবে? কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

“সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?”সূরা নাহল আয়াত ১৭

ফিরিশতাগণ, জিন্নগণ, নবীগণ, ওলীগণ, মূর্তি-প্রতিমা, বৃক্ষ, জড় পদার্থ ইত্যাদি যা কিছু মুশরিকগণ উপাসনা করত সকল উপাস্যের ক্ষেত্রেই এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। তারা সকলেই স্বীকার করত যে, এ সকল উপাস্যের কেউই কোনো কিছুর স্রষ্টা নন। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

“তারা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা মৃত জীবন-বিহীন এবং পুনরুত্থান কখন হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো চেতনা নেই।”সূরা নাহল ২০-২১.

প্রথম যুক্তিটি মুশরিকদের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। দ্বিতীয় আয়াতটি ফিরিশত, ঈসা (আঃ), জিন্নগণ বা অনুরূপ জীবিত উপাস্য ছাড়া মুশরিকদের অধিকাংশ উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

“বরং তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি তদ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার বৃক্ষাদি উদ্গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য বিচ্যুত হয়।”সূরা নামল আয়াত ৬০.
এ বিষয়টিও মুশরিকদের জীবিত, মৃত ও জড় সকল উপাস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার সৃষ্টির একত্ব উল্লেখ করে শিরকের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়েছে।

এ সকল উপাস্য উপাসকদের ডাকে সাড়া দেয় না

কুরআন কারীমে বিভিন্ন স্থানে এ সকল উপাস্যের অসহায়ত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

"তোমরা তাদের ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনে না এবং শুনলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় না। তোমরা তাদেরকে যে শরীক করেছ কিয়ামতের দিন তারা তা অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারে না।"সূরা ফাতির আয়াত ১৪

মুশরিকগণ যাদের ডাকে তাদের সাড়া দেওয়ার অক্ষমতা বর্ণনা করে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلا فِي ضَلالٍ

"সত্যের আহবান তাঁরই (আল্লাহরই)। যারা তাকে ব্যতীত আহবান করে অপরকে, তাদেরকে কোনো সাড়াই দেয় না তারা। তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছাবে- এই আশায় তার হস্তদ্বয় প্রসারিত করে পানির দিকে, আর এভাবে কখনোই পানি তার মুখে পৌঁছাবে না। কাফিরদের দু'আ- আহবান নিষ্ফল।"সূরা রা'দ আয়াত ১৪.

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

“সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে না? এবং তারা তার প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা হবে তাদের শত্রু এবং তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে।”সূরা আহকাফ আয়াত ৫-৬.

এ বিষয়টিও মুশরিকদের সকল উপাস্যের বিষয়েই প্রযোজ্য। মুর্তি, প্রতিমা, ফিরিশতা, জিন্ন, নবী, ওলী ও অন্যান্য সকল মাবূদের ক্ষেত্রেই বিষয়টি সত্য। যারা আল্লাহকে ছেড়ে বিপদে আপদে ঈসা মাসীহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, উযাইর, জিবরাঈল, আযরাঈল (আলাইহিমুস সালাম) বা কোনো সত্যিকার ওলী বা মনগড়া আল্লাহর পুত্রকন্যা বা প্রতিমা লাত, মানাত বা অন্য কাউকে ডাকছে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা বলা হয়েছে। এ কথা মনে করার সুযোগ নেই যে, জিবরাঈল, ইসরাফীল, অন্য কোনো ফিরিশতা, নবীগণ বা ওলীগণকে ডাকলে হয়ত শুনতে পান। কাউকেই আল্লাহ কোনো অলৌকিক বা গাইবী শ্রবণের ক্ষমতা দেন নি। সবই মুশরিকদের কল্পনা মাত্র। সবচেয়ে বড় কথা যে, এরা কেউই তাদের অনুসারী বা ভক্ত নামধারীদের ভক্তি বা ইবাদতে খুশি নন এবং এদের জন্য কোনো সুপারিশ তাঁরা করবেন না।

মালিককে রেখে চাকরকে মাবূদ বানানো চূড়ান্ত বোকামি

সকল মুশরিকই স্বীকার করছে যে, মহান আল্লাহই একমাত্র মালিক, রাজা এবং সর্বশক্তিমান প্রতিপালক। পাশাপাশি তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তার সাথে যাদেরকে তারা ইবাদত করছে তারা সকলেই মহান আল্লহরই সৃষ্টি এবং তাঁরই বান্দা। এ কথা স্বীকার করার পরে মহান মালিককে ছেড়ে চাকরবাকরদের ইবাদত করা বা তাদের নিকট নিজের চূড়ান্ত অসহায়ত্ব ও ভক্তি প্রকাশ করার মত বোকামি আর কি হতে পারে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلا

“যারা কুফরী করেছে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার দাসদেরকে ওলী-অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে? আমি কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জাহান্নাম।”সূরা কাহাফ আয়াত ১০২,

মহান আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করা যায় না

শিরকের মূল হলো মহান আল্লাহর বিষয়ে কু-ধারণা বা “অব-ভক্তি’ এবং বান্দার বিষয়ে ‘অতি-ধারণা’ বা ‘অতিভক্তি’। আর এর অন্যতম কারণ মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা। মুশরিকদের যুক্তিই ছিল পৃথিবীর রাজা-বাদশাহগণের নিকট আবেদন করতে যেমন মন্ত্রী, খাদেম, দারোয়ান, সামন্তরাজা বা অনুরূপ ব্যক্তিবর্গের সুপারিশ বা মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়, আল্লাহর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মধ্যস্থতার প্রয়োজন হবে না কেন। দুনিয়ার সাধারণ একজন রাজা এত আমত্য-পরিষদ রাখেন আর সকল রাজার মহারাজা মহান আল্লাহ তা রাখবেন না কেন? ইত্যাদি।

কুরআনে এরূপ তুলনা করতে বারংবার নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে তুলনা করা যায় না। একজন মানুষ মহারাজা তার সেনাপতি, খাদেম, সামন্ত শাসক বা কর্মকর্তাদের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী, তিনি নিজে সবকিছু দেখতে, শুনতে বা জানতে পারেন না। তিনি অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের সুপারিশ গ্রহণ করেন, অথবা মূল বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, তাই সংশ্লিষ্ট অফিসারের সুপারিশের ভিত্তিতেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সব কিছু নিজে জানা ও বিচার করা তো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মহান আল্লাহকে এরূপ মানুষ মহারাজার সাথে তুলনা করার অর্থ তার রুবূবিয়্যাতের সাথে কুফরী করা ও তাঁর বিষয়ে ‘কু-ধারণা’ পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

“সুতরাং আল্লাহর জন্য কোনো তুলনা-উদাহরণ স্থাপন করো না। আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।”সূরা নাহল আয়াত ৮৪.

// আল্লাহর মাহবূব বান্দারা মুশরিকদের উপর অসন, শয়তানের প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা এবং বিভিন্ন মিথ্যা অপপ্রচারের কারণে মুশরিকগণ বিশ্বাস করত যে, ফিরিশতাগণ ও আল্লাহর অন্যান্য প্রিয় বান্দা তাদের ইবাদত পেয়ে খুশি হন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন। স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান ফিরিশতাগণের কল্পিত রূপে বা অন্যান্য নবী, ওলী বা কল্পিত মা'বুদদের বেশ ধরে তাদেরকে এরূপ ধারণা প্রদান করত, যেমন ভারতীয় হিন্দু পূজারীদের সামনে স্বপ্নে বা জাগরণে কালী, গনেশ, মহামায়া ইত্যাদি রূপে 'প্রকাশিত' হয়ে তাদের শির্ককে সঠিক বলে ধারণা দেয়। মুসলিম সমাজে যারা শিরকে লিপ্ত তাদেরকেও এভাবে স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান প্রতারিত করে।

কোনো নবী-রাসূল কখনোই আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করার কথা বলতে পারেন না। আল্লাহ ছাড়া কোনো ফিরিশতা বা কোনো নবীকে ইলাহ তো দূরের কথা 'রাবব' বা প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণের কথাও তিনি বলতে পারেন না। আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, তবে আপেক্ষিক লালন-পালন এবং তত্ত্বাবধানের অর্থে 'রাবব' বলা যায়। কোনো নবী-রাসূল বা কোনো সত্যিকার ধার্মিক মানুষ কোনো ফিরিশতা বা নবীকে ইবাদত করা তো দূরের কথা তাদের তত্ত্বাবধানের বা বিশ্ব-পরিচালনার কোনোরূপ ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করতেও তারা বলতে পারেন না। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কিতাব, হিকমাত ও নুবুওয়াত প্রদান করার পর তার জন্য শোভন নয় যে, সে বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও',বরং সে বলবে, 'তোমরা আল্লাহওয়ালা-রাববানী হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর। আর সে তোমাদের নির্দেশ দিবে না যে, তোমরা ফিরিশতাগণ এবং নবীগণকে আল্লাহর পরিবর্তে রাবব হিসেবে গ্রহণ কর। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পরে কি সে তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবে?"সূরা আলে ইমরান ৭৯-৮০.

অন্যান্য স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় কোনো বান্দাও যদি কোনোভাবে নিজেকে ইলাহ বলে দাবি করে বা কোনো মানুষের ইবাদত বা চূড়ান্ত ভক্তি গ্রহণে আগ্রহী হয় তবে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন। মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

"তারা বলে, 'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বেড়ে কথা বলে না; তারা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।তাদের মধ্যে যে বলবে 'আমিই ইলাহ আল্লাহ ব্যাতীত' আমি তাকে প্রতিফল দিব জাহান্নাম;এভাবেই আমি যালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।"সূরা আম্বিয়া আয়াত২৬-২৯.

মুশরিকগণ নেককারগণের শাফা'আত পাবে না

আমরা দেখেছি যে, ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রকৃত বা কল্পিত প্রিয় বান্দাগণের শাফা'আত লাভ এবং তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ইচ্ছাই শিরকের অন্যতম কারণ। কুরআন কারীমে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে শাফা'আতের আশায় তার শিরক করত তা যে তারা পাবে না। বারংবার কিয়ামতের দিবসে মুশরিকদের চরম অসহায় ও বান্ধবহীন অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

আমরা জানি যে, যীশুখৃস্টের বা ঈসা মাসীহের (আঃ) প্রতি ভক্তির সর্বোচ্চ প্রমাণ দিতে তাঁর নামে নিজেদের নামকরণ করেছে খৃস্টানগণ বা মাসীহীগণ। ঈসা (আঃ)-এর ভক্তির নামে তাকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে তাঁরা। তাদের একটিই দাবি যে, ঈসা (আঃ) তাদের আখিরাতের কান্ডারী, মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা (savior)। অনুরূপভাবে আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাগণকে, জিন্নগণকে, কোনো কোনো নবীকে এবং মনগড়া অনেক আল্লাহর প্রিয় বান্দা বা সন্তানকে ইবাদত করেছে। তাদেরও বিশ্বাস যে, এরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করবেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য যে, এরা কেউই এদের জন্য শাফা'আত করবেন না। এর অর্থ এ নয় যে, নবীগণ, ফিরিশতাগণ বা অন্যান্য নেক বান্দা শাফা'আত করবেন না।

তাঁরা শাফা'আত করবেন শুধু তাদের জন্য যারা শিরক থেকে মুক্ত ছিল, যাদের ন্যূনতম তাওহীদে মহান আল্লাহ খুশি ছিলেন এবং যাদের বিষয়ে শাফা'আত করতে মহান আল্লাহ তাদেরকে অনুমতি দিবেন।

অন্ধ আবেগে বিবেকের দাবি অস্বীকারের পরিণতি

আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তার ইচ্ছার বাইরে এরা কেউ কিছু করতে পারে না ইত্যাদি সবই ঠিক। তিনি কাউকে ক্ষমতা দিয়েছেন বলে সুস্পষ্ট বলেন নি তাও ঠিক। অন্য কাউকে তিনি ডাকতে বলেন নি একথাও ঠিক। একমাত্র তাকেই ডাকতে বলেছেন এ কথাও ঠিক। তবুও এরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র। এদেরকে আল্লাহ ভালবেসে কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে সরাসরি জানান নি। তবে যুক্তিতে তো বুঝা যায়। যুগযুগ ধরে সকলেই বলছে। নবী-রাসূলগণ থেকে পিতা-পিতামহের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ নিয়ম ভুল হতে পারে না। ... এভাবেই সকল যুক্তি ও বিবেকের বাণীকে তারা অস্বীকার করেছে। সকল যুক্তি অন্ধ আবেগ এবং দীর্ঘদিনের কর্মের ও বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ ভালবাসার কাছে হেরে গিয়েছে। মুশরিকদের এরূপ অন্ধ আবেগ ও অযৌক্তিক বিবেকবিরোধী আচরণে কষ্ট পেতেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"যার অপকর্মকে তার জন্য সৌন্দর্যময় করে দেখানো হয়েছে ফলে সে তা ভাল বলে মনে করেছে, আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণ যেন ধ্বংস না হয়। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।"সূরা ফাতির আয়াত ৮.

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ

“যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার নিকট নিজের অপকর্মগুলি শোভন প্রতীয়মান হয় এবং যারা নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে?”সূরা মুহাম্মদ আয়াত ১৪.
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

“বল, ‘আমি কি তোমাদেরকে তাদের সংবাদ দিব যারা কর্মে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত? তারা তো সে সকল মানুষ, দুনিয়ার জীবনে যাদের কর্ম বিভ্রান্ত হয়েছে কিন্তু তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে।”সূরা কাহাফ আয়াত১০৩-১০৪.

মুর্তি, ছবি, কবর বা স্মৃতিময় দ্রব্য

মানব ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি যে, যুগে যুগে সকল সমাজের মুশরিকদেরই ধারণা যে, নেককার মানুষ মৃত্যুর পরে আরো বেশি অলৌকিক ক্ষমতা ও অধিকার লাভ করে। তারা দেহের খোলস থেকে মুক্ত হয়ে পুরো আত্মিক আধিপত্য ও ক্ষমতা অর্জন করে। এজন্য জীবিত নেককারদের চেয়ে মৃত নেককারদের ইবাদত করা বা তাদেরকে আল্লাহর শরীক বাননোর প্রবণতা সব মুশরিকদের মধ্যেই বেশি।

আমরা দেখেছি যে, বিপদে আপদে মূর্ত কিছুকে আকড়ে ধরে নিজের মনের আবেগ জানানো এবং বিপদ থেকে ত্রাণ প্রার্থনা করার আগ্রহ শিরকের অন্যতম কারণ। দুর্বল চিত্ত মানুষ অদৃশ্য কোনো কিছুর কাছে প্রার্থনা করে পুরো তৃপ্তি পায় না। মূর্ত কিছুকে জড়িয়ে ধরতে চায়। এজন্য মৃত মৃত নেককার ব্যক্তির ইবাদত করা বা তার প্রতি চূড়ান্ত ভক্তি-বিনয় প্রকাশের জন্য মুশরিক ব্যক্তি একটি মূর্ত কিছু সন্ধান করে। এজন্য মূল বাহন (১) উক্ত ব্যক্তির সমাধি বা কবর, (২) উক্ত ব্যক্তির ছবি,মূর্তি বা প্রতিকৃতি এবং (২) উক্ত ব্যক্তির স্মৃতিবিজড়িত স্থান বা দ্রব্য। সাধারণত এগুলিকে কেন্দ্র করেই শিরক আবর্তিত হয়।

ইসলামে শিরকের এ সকল উপকরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেন কোনোভাবে মানবীয় দুর্বলতা বা শয়তানের প্রবঞ্চনার কারণে কোনো মুমিন এগুলির প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে যেয়ে শিরকে নিপতিত না হয়। ছবি, প্রতিকৃতি, মুর্তি ইত্যাদি তৈরি, সংরক্ষণ ইত্যাদি কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়েছে। স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্য বা স্থানের বিষয়ে ইসলামী নির্দেশনা ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি। কবর যেন মানুষের অতিভক্তির বিষয়ে পরিণত না হয় সে জন্য কবর কেন্দ্রিক মসজিদ ও ইবাদত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্বোপরি কবর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচু করা, পাকা করা, চুনকাম করা, কবরের উপরে কিছু লেখা ইত্যাদি নিষেধ করা হয়েছে। মুর্তি, ছবি ও প্রতিকৃতির পাশাপাশি উচু কবর ভেঙ্গে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে খলীফা আলীর (রাঃ) পুলিশ বাহিনীর প্রধান আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন:

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ ...وَلا صُورَةً إِلا طَمَسْتَهَا

"আলী (রাঃ) আমাকে বলেন: আমি তোমাকে সেই দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করছি, যে দায়িত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন : যত মূর্তি-প্রতিকৃতি দেখবে সব ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবে, (স্বাভাবিক কবরের পরিচিতি জ্ঞাপক সামান্য উচ্চতার বেশি) কোনো উঁচু কবর দেখলে তা সব সমান করে দেবে এবং যত ছবি দেখবে মুছে ফেলবে।" মুসলিম আস সহিহ ২/৬৬৬.

অন্য হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন :

إِنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কবরের উপর ঘর তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।' ইবনু মাজাহ, আস-সুনান১/৪৯৮

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় মোট ৫টি বিষয় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন: কবর চুনকাম করা, কবরের উপরে বসা, কবর বাঁধানো বা কবরের উপরে ঘর জাতীয় কিছু তৈরি করা, কবরের উপরে লেখা এবং অতিরিক্ত মাটি এনে কবর উঁচু করা।

শিরকের ভয়াবহ পরিণতি

শিরক-কুফরের মূলোৎপাটনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহে বিশেষভাবে বারংবার এর ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা এ বিষয়ে যা জানতে পারি তার অন্যতম:

ভয়ঙ্করতম পাপ

কুরআন ও হাদীসে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিরক-কুফর মানব জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। মহান আল্লাহ বলেন:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“বল, ‘এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমাদেরকে পড়ে শুনাই: তা এই যে, তোমরা তাঁর কোনো শরীক করবে না .....।”সূরা আন'আম আয়াত **১৫১.**

ইতোপূর্বে আমরা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “জঘণ্যতম পাপ এই যে, তুমি কাউকে আল্লাহর সমতূল্য বানাবে, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।”

এবং আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

"সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হলো আল্লাহর সাথে শিরক করা, মানুষ হত্যা করা, পিতামাতার অবাধ্যতা করা এবং মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"বুখারি, আস সহিহ ৬/২৫১৯.

কুফর-শিরকের পাপ আল্লাহ ক্ষমা করেন না

তাওবা বা অনুতপ্ত হয়ে পাপ বর্জন করা সকল পাপের ক্ষমার পথ। তবে মহান আল্লাহ তাওবা ছাড়াও নেক কর্মের কারণে, শাস্তির মাধ্যমে বা তাঁর অপার করুণায় অন্য সকল পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তবে শিরকের পাপ তিনি ক্ষমা করেন না। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।"সূরা নিসা আয়াত ৪৮.

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا

“আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছ ক্ষমা করেন। এবং যে কেউ আল্লার সাথে শরীক করে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়।”সূরা নিসা আয়াত **১১৬**

শিরক-কুফর সকল নেক কর্ম ধ্বংস করে

অন্য সকল পাপের সাথে শিরক-কুফরের মৌলিক পার্থক্য এই যে, সাধরণভাবে পাপের কারণে পুন্য বিনষ্ট হয় না। কিন্তু শিরকের কারণে মানুষের সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী করা হয়েছে যে, ‘তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত’।”সূরা যুমার আয়াত৬৫.

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“কেউ ঈমানের সাথে কুফরী করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।”সূরা ময়িদা বয়াত ৫

মহান আল্লাহ ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব, নূহ, দাঊদ, সুলাইমান, আইঊব, ইউসূফ, মূসা, হারূন, যাকারিয়্যা, ইয়াহইয়া, ঈসা, ইলইয়াস, ইসমাঈল, ইলইয়াসা, ইউনুস, লূত (আলাইহিমুস সালাম) ও তাঁদের বংশের নেককার মানুষদের কথা উল্লেখ করে বলেন:

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"এ হলো আল্লাহর হেদায়াত, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি এদ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন। তারা যদি শির্ক করত তবে তারা যা কর্ম করত সবই বিনষ্ট ও নিষ্ফল হয়ে যেত।"সূরা আন'আম আয়াত ৮৮

শিরক-কুফর জাহান্নামের অনন্ত শাস্তির কারণ

শিরক মুক্ত সকল পাপে লিপ্ত মানুষ আখিরাতে মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে, অথবা আল্লাহর অনুগ্রহে কারো শাফা'আতের কারণে বা শাস্তিভোগের পরে জান্নাত লাভ করবেন। সকল পাপীই মহান আল্লাহর বিশেষ ক্ষমার আশা করতে পারেন। তবে শিরকে লিপ্ত মানুষের জন্য কোনোই আশা নেই। জান্নাত একমাত্র তাওহীদ-পন্থীদের আবাসস্থল। এজন্য মহান আল্লাহ শিরকে লিপ্তদের জন্য তা হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

"কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।"সূরা মায়িদা আয়াত ৭২.

আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন:

مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً

“যে ব্যক্তি আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে পৃথিবী পরিমাণ পাপ-সহ আমার সাথে সাক্ষাত করবে আমি সমপরিমাণ ক্ষমা-সহ তার সাথে সাক্ষাত করব।”মুসলিম, আস সহীহ ৪/২০৬৮.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلا الشِّرْكَ

“জাহান্নামে সবচেয়ে কম শাস্তি ভোগ করবে যে ব্যক্তি তাকে মহান আল্লাহ বলবেন, পৃথিবীর সবকিছুর মালিকানা তুমি যদি পেতে তবে কি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সবকিছু ফিদইয়া হিসেবে দান করে দিতে? লোকটি বলবে: হ্যাঁ। মহান আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক সহজ একটি বিষয় চেয়েছিলাম; তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করছিলে তখন আমি তোমার কাছে চেয়েছিলাম যে তুমি আমার সাথে শিরক করবে না। কিন্তু তুমি শিরক পরিত্যাগ করলে না।”বুখারি আস সহীহ ৩/১২১৩

মুশরিকগণের পরিচিতি ও তাদের শিরকী বিশ্বাসঃ

১//মুশরিকগণের পরিচিতি ও তাদের শিরকী বিশ্বাসঃ

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মুশরিকগণের একটি সুন্দর শ্রেণীভাগ করেছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী। তিনি ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’ গ্রন্থে তিনি মুশরিকদেরকে তিন শ্রেণীতে এবং ‘আল-বালাগুল মুবীন’ গ্রন্থে মুশরিকদেরকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তাঁর শ্রেণীভাগ নিম্নরূপ:

ক)জ্যোতিষি, প্রকৃতিপূজারী বা নক্ষত্র পূজারিগণ

এরা দাবি করে যে, গ্রহ-নক্ষত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। এদের ইবাদত করলে পৃথিবীতে উপকার পাওয়া যায়। মানুষের প্রয়োজন বা হাজত এদের কাছে পেশ করা সঠিক। তারা বলে, আমরা গবেষণা করে উদ্ঘাটন করেছি যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ব্যক্তির সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, সফলতা-ব্যর্থতা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এ সকল গ্রহ-নক্ষত্রের বুদ্ধিমান সত্তা আছে যার ভিত্তিতে তারা যাত্রা ও চলাচল করে। এরা এদের পূজারীদের বিষয়ে অচেতন নয়। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তারা বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের নামে মন্দির তৈরি করেছে এবং তাদের ইবাদত করে।

খ)মুশরিকগণ

এরা মুসলিমদের সাথে তাওহীদুর রূবুবিয়্যাতের অধিকাংশ বিষয়ে একমত। তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের বৃহৎ বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই। এছাড়া যে বিষয়গুলি তিনি নিজেই সিদ্ধান্ত নেন এবং অন্য কাউকে কোনো এখাতিয়ার বা ক্ষমতা প্রদান করেন নি সে সকল বিষয়ও তিনি পরিচালনা করেন। অন্যান্য বিষয়ে তারা মুসলিমদের সাথে একমত নয়। তারা দাবি করে যে, তাদের পূর্ববর্তী নেককার বুজুর্গগণ আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তাদেরকে ‘উলূহিয়্যাত’ বা ‘উপস্যত্ব’ প্রদান করেন। এভাবে তারা অন্যান্য বান্দাদের ‘ইবাদত’ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। যেমনভাবে রাজাধিরাজ মহারাজের খাদিম বা সেবক তার সেবা ও ভক্তি করে যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় তখন মহারাজ সেই খাদিমকেও রাজত্ব উপঢৌকন প্রদান করেন বা তাকে একটি বিশেষ এলাকার ‘সামন্ত’ রাজা বানিয়ে দেন। তখন সে রাজত্বের পরিচালনার দায়ভার এ সামন্ত রাজার উপরেই বর্তায়। আর উক্ত রাজ্যের প্রজাদের দায়িত্ব হয়ে যায় এ রাজার আনুগত্য করা।

তারা বলে, এ সকল বুজুর্গের ইবাদত না করে শুধু আল্লাহর ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। এ ছাড়া আল্লাহ অতি মহান ও অতি ঊর্ধ্বে। তার নৈকট্য লাভের জন্য সরাসরি তাঁর ইবাদত কোনো কাজে আসবে না। বরং এ সকল বুজুর্গের ইবাদত করতে হবে যাতে তারা আল্লাহর নৈকট্য পাইয়ে দিতে পারেন। তারা বলে, এ সকল বুজুর্গ শুনেন, দেখেন, তাদের উপাসকদের জন্য সুপারিশ করেন, তাদের বিষয়াদি পরিচালনা করেন এবং তাদের সাহায্য করেন।

এ সকল দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে তারা এসকল বুজুর্গের নাম পাথরে খোদাই করে রাখে এবং তাদের নাম বিজড়িত পাথর সামনে রেখে তাদের ইবাদত করে। প্রথম যুগের মুশরিকদের তিরোধানের পরে পরবর্তী প্রজন্মের মুশরিকগণ মূল বুজুর্গ উপাস্য ও তাদের স্মৃতিতে বানানো মুর্তি বা স্তম্ভের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তারা মনে করে এ সকল মুর্তি বা স্তম্ভই বুঝি উপাস্য। এজন্য মহান আল্লাহ এ সকল মুশরিকদের দাবি দাওয়া রদ করে কখনো বলেছেন যে, বিশ্ব পরিচালনা, রাজত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র তারই। কখনো তিনি বলেছেন যে, তারা যাদের ইবাদত করে তারা জড় পদার্থ মাত্র।

গ)খৃস্টানগণ

খৃস্টানগণ দাবি করে যে, ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর সাথে আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য আছে এবং তিনি অন্য সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। কাজেই তাকে 'আব্দ' অর্থাৎ দাস বা 'বান্দা' বলা উচিত নয়। কারণ তাকে 'আব্দ' বা 'বান্দা' বললে তাকে অন্য সকল সৃষ্টির সমান বানিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ করা তাঁর মহান মর্যাদার সাথে বেয়াদবী। সর্বোপরি এতে আল্লাহর সাথে তার যে বিশেষ নৈকট্যের সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশে অবহেলা করা হয়।

এরপর তাদের কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাঁর বিশেষ নৈকট্য বুঝানোর জন্য তাকে 'আল্লাহর পুত্র' বলতে পছন্দ করেন। তাদের যুক্তি এই যে, পিতা তার পুত্রকে বিশেষভাবে দয়া করেন এবং নিজের চোখের সামনে তাকে প্রতিপালন করেন। আর সাধারণ দাস বা চাকরদের চেয়ে

পুত্র অধিক মর্যাদার অধিকারী হয়। এজন্য ‘পুত্র’ পদটিই তাঁর মর্যাদার সাথে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ।

এছাড়া তাদের কেউ কেউ তাকে ‘আল্লাহ’ বলতে শুরু করেন। তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ ঈসা মাসীহের মধ্যে অবতরণ করেছেন এবং তাঁর মধ্যে অবস্থান করছেন। আর এজন্যই তো তিনি মৃতকে জীবিত করা, মাটি থেকে পাখি বানানো ইত্যাদি মানুষের অসাধ্য অলৌকিক কাজ করতে সক্ষম হন। কাজেই তাঁর কথাই আল্লাহর কথা এবং তাঁকে ইবাদত করা অর্থ আল্লাহকে ইবাদত করা।

পরবর্তী প্রজন্মের খৃস্টানগণের মধ্যে ঈসা (আঃ)-কে ‘আল্লাহর পুত্র’ বলার এ সকল দার্শনিক যুক্তি ও চিন্তা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অসচেতনতা বিরাজ করে। ফলে তারা ‘আল্লাহর পুত্রত্ব’ বলতে প্রকৃত পুত্রত্বই বুঝতে থাকে। কেউ মনে করতে থাকে যে, তিনি প্রকৃতই ‘আল্লাহ’। এজন্য আল্লাহ তাদের বিভ্রান্তি অপনোদনে কখনো বলেছেন যে, তাঁর কোনো স্ত্রী নেই, কখনো বলেছেন যে, তিনিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা।

এ তিন দলেরই মতামত প্রমাণের জন্য অনেক লম্বা চওড়া যুক্তি তর্কের বহর রয়েছে। কুরআন কারীমের শেষের দু দলের শিরকের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের বিভ্রান্তি, বিভ্রান্তিকর দালিল-প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে খন্ডন করা হয়েছে।”

অতঃপর তিনি বলেন: “শির্ক রোগে আক্রান্ত মানুষেরা বিভিন্ন প্রকারের। তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর মহত্ব ও মর্যাদা ভুলে গিয়েছে। সে কেবল শরীকগণেরই ইবাদত করে এবং কেবলমাত্র তাদের কাছেই নিজের হাজত-প্রয়োজন পেশ করে। আল্লাহর কাছে সে নিজের প্রয়োজন জানায় না বা আল্লাহর দিকে সে দৃষ্টিপাতও করে না। যদিও সে নিশ্চিতভাবে জানে ও মানে যে এই মহাবিশ্বের অনাদি-অনন্ত স্রষ্টা আল্লাহই। মুশরিকদের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই নেতা, প্রভু এবং বিশ্বের পরিচালক। কিন্তু তিনি তাঁর ‘উলূহিয়্যাত’-এর কিছু মর্যাদা তার কোনো কোনো বান্দাকে দিয়ে থাকেন এবং তাদের সুপারিশ কবুল করেন। তাদেরকে তিনি কিছু বিশেষ বিষয়ে পরিচালনার বা কার্যনির্বাহের দায়িত্ব প্রদান করেন। যেমন

মহারাজ বা রাজাধিরাজ তার রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে ‘সামন্ত’ রাজা নিয়োগ করেন এবং তাকে উক্ত এলাকার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেন। বৃহৎ বিষয়গুলি ছাড়া সাধারণ সকল বিষয় পরিচালনা ও কার্য নির্বাহ করার দায়িত্ব এ সকল ছোট রাজাদের উপর অর্পিত হয়। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী মুশরিক আল্লাহর এ সকল বিশেষ বান্দাদেরকে ‘আল্লাহর বান্দা’, ‘আল্লাহর দাস’ বা আল্লাহর আবদ’ বলতে দ্বিধাবোধ করে; কারণ এতে ‘এ সকল খাস বান্দাকে অন্য সব ‘আম’ বান্দার সমপর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এজন্য সে এরূপ খাস বান্দাদেরকে আল্লাহর বান্দা না বলে ‘আল্লাহর পুত্র’ বা ‘আল্লাহর মাহবূব’ (আল্লাহর প্রিয়) বলে। আর নিজেকে সে এরূপ ‘খাস বান্দাদের’ বান্দা বলে নামকরণ করে। যেমন ‘আব্দুল মাসীহ’, আব্দুল উয্যা, ইত্যাদি। ইহূদী, খৃস্টান, সাধারণ মুশরিক এবং মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর দীনের অনুসারী সীমালঙ্ঘনকারী মুনাফিকদের অধিকাংশই এই রোগে আক্রান্ত।’’

ঘ)কবর পূজারিগণঃ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ তাঁর আল-বালাগুল মুবীন গ্রন্থে বলেন: ‘‘মুশরিকগণের চতুর্থ দলটি হইল কবর পূজারীদের দল। তাহাদের দাবী হইল যখন আল্লাহ তাআলার কোন বান্দা ইবাদত বন্দেগী সাধন-ভজন দ্বারা আল্লাহর দরবারে দোআ কবুল হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তির ইনতিকালের পর তাহার আত্মা বিরাট শক্তিশালী এবং ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে। সুতরাং যে লোক এমন বুযুর্গের আকৃতি ও চেহারার ধ্যান করে অথবা তাহাদের থাকার স্থান এবং কবরকে খুব বিনয়, নম্রতার এবং ভক্তি সহকারে সিজদাহ করে, তাহার যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে এই বুযুর্গের আত্মা অবহিত হইয়া যায়; দুনিয়া ও পরকালের তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহার জন্য সুপারিশকারী হয়। উল্লেখিত শিরক ও বিদআতীদের বাতিল মতবাদ প্রচার করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন...।

... ইহা আমাদের ভালভাবে বুঝা উচিত যে, উল্লেখিত কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অদৃশ্য আত্মা ও দেহসমূহের যে ইবাদত বন্দেগী এই পৃথিবীতে করা হয় এবং তাহাদের নিকট যে বস্তুর প্রার্থনা করা হয় ঐ সব আত্মা ও দেহসমূহ প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হাশরের ময়দানে যখন আল্লাহ তাআলা তাহাদিগকে প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাহারা বলিবে আমরা এই সম্বন্ধে অবগত নই।

পূজারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা ও আল্লাহর দরবারে তাহাদের জন্য শাফায়াত করা তো দূরের কথা, তাহাদের কাজকে আদৌ স্বীকৃতি দিবে না

মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক-কুফর

ইতোপূর্বে আমরা কুরআন-হাদীসের আলোকে তৎকালীন আরব ও ইহূদী খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের শিরক সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এরপর আর সমাজে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন থাকে না। কারণ এগুলির আলোকে সমাজে প্রচলিত শিরক সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা খুবই সহজ। তা সত্ত্বেও এখানে শীয়াগণ এবং সমমনা মানুষদের প্রচারিত বিভিন্ন শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। মহান আল্লাহর তাওফীক ও কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করছি।

রুবূবিয়্যাতের শিরক

আমরা ইতোপূর্বে রুবূবিয়্যাতের তাওহীদ এবং রুবূবিয়্যাতের শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রুবূবিয়্যাতের বা প্রতিপালনের তাওহীদের মূল হলো, যে এ বিশ্ব পরিচালনা, সৃষ্টি, বিনাশ, ধ্বংস, রিযক, সম্পদ, সুস্থতা, অসুস্থতা, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদি সকল কিছুর ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহরই। এ ক্ষমতায় কেউ তার শরীক নয় এবং তিনি নিজেও কাউকে কখনো তাঁর এ ক্ষমতায় শরীক করেন নি। আল্লাহর নবীগণ, ওলীগণ, ফিরিশতাগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা। আল্লাহ এ সকল বান্দাকে ভালবাসেন, দয়া করে তাঁদের দু'আ ইচ্ছা করলে কবুল করেন, তাঁদেরকে ইচ্ছা করলে সুপারিশ করার সুযোগ দিবেন, ইচ্ছ করলে তাদের সুপারিশ কবুল করতে পারেন, তবে কাউকে কোনো ক্ষমতা দেন নি, তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন নেই। আল্লাহ ফিরিশতাদেরকে অনেক দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু তাঁদেরকে কোনো ক্ষমতা দেন নি। আর কোনো মানুষকে তিনি কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব কিছুই দেন নি।

আর এ পর্যায়ের শিরকের মূল হলো মুজিযা, কারামত, শাফা'আত বিষয়ক আয়াত, আল্লাহর মাহবূবিয়্যাত বিষয়ক কথা ইত্যাদিকে পুঁজি করে একথা মনে করা যে, আল্লাহর কোনো বান্দা কোনো বিশেষ কর্মের কারণে বা বিশেষ পর্যায়ে মহান আল্লাহ থেকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার কোনো অলৌকিক ক্ষমতা, বিশ্বপরিচালনায় হস্তক্ষেপ বা কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা লাভ করেছেন, করেন বা করবেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন মুশরিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও যুক্তি

এবং কুরআন-হাদীসের বক্তব্য আমরা দেখেছি। এখন আমরা এ বিষয়ে সমাজে প্রচলিত কিছু বিষয় আলোচনা করব।

ক্ষমতা বিষয়ক শিরক

আমরা ইতোপূবে দেখেছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জাগতিক উপকরণাদি ছাড়া নিজের ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে কারো মঙ্গল-অমঙ্গল করতে পারে, হেদায়াত বা পথভ্রষ্ট করতে পারে, বিপদ দান করতে বা দূর করতে পারে, বৃষ্টি দিতে বা বন্ধ করতে পারে, জান্নাতে বা জাহান্নামে নিতে বা বের করতে পারে, জীবন, মৃত্যু, সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সুস্থতা, অসুস্থতা, রিযক ইত্যাদি বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা হলো আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের শিরক। আরবের মুশরিকগণ এ সকল বিষয়ে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাস করত, তবে আল্লাহ তাঁর কোনো কোনো বান্দাকে এরূপ সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দিয়েছে বলে বিশ্বাস করত। শীয়াদের মধ্যে আলী (রাঃ), তাঁর বংশের ইমামগণ, ইমামগণের খলীফাগণ, তাদের মধ্যকার ওলী-আল্লাহগণ ও পীর-মাশাইখের বিষয়ে এমন অগণিত উদ্ভট কল্পকাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে যে, এ সকল মানুষ এরূপ কিছু ক্ষমতা রাখেন। শীয়াদের প্রভাবে সুন্নী সমাজেও এরূপ শিরকী বিশ্বাস প্রসার লাভ করেছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম অর্ধ সহস্র বৎসরের পরে, ক্রুসেড ও তাতার আক্রমন চলাকালীন ও পরবর্তী সময়গুলিতে লেখা আওলিয়াগণের জীবনী, তাঁদের নামে প্রচলিত অনেক কথাবার্তা থেকে এরূপ অনেক বিশ্বাস সাধারণ মানুষদের মধ্যে জন্মেছে। মূলত এ সকল গল্প,কাহিনী ও এ সকল যুগের কোনো কোনো আলিমের কথাই এ সকল শিরকের পক্ষের ‘দলীল’।

আমরা জানি যে, ইবাদতের শিরক বা কর্মের শিরকের উৎস হলো রুবূবিয়্যাতের শিরক বা আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো কল্যাণ বা অকল্যানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা। এরূপ বিশ্বাসই মানুষকে এরূপ ক্ষমতাধরকে ইবাদত করতে বা তাঁকে ‘চূড়ান্ত ও অলৌকিকভাবে ভক্তি করতে ও তাঁর কাছে নিজের চূড়ান্ত বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ’ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্য কুরআন কারীমে এ বিষয়ক বিভ্রান্তি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দূর করা হয়েছে। বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ফিরিশতা, নবী, ওলী কাউকে কোনোরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বিষয়েও বারংবার ঘোষণা করা

হয়েছে যে, তাঁর দায়িত্ব প্রচার ও দীন প্রতিষ্ঠা। কারো হেদায়াত, ভাল, মন্দ, কল্যাণ, অকল্যাণ ইত্যাদির কোনোরূপ দায়িত্ব, অধিকার বা ক্ষমতার ঝামেলা মহান আল্লাহ তাঁকে প্রদান করেন নি। কুরআন কারীমের এ বিষয়ক বিভিন্ন নির্দেশনা আমরা ইতোপূর্বে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছি।

কুরআন কারীম ও তদসঙ্গে প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলির পাঠ ও অধ্যয়নের অভাবই মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এরূপ শিরকের প্রসারের মূল কারণ। এজন্য এ সকল শিরকী বিশ্বাসের পক্ষে যারা প্রচার করেন তারা কখনোই কুরআন কারীম বা হাদীস শরীফ থেকে একটি সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যও পেশ করতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ অমুক আয়াতে বলেছেন বা অমুক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে বিশ্ব পরিচালনা বা কল্যাণ-অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা প্রদান করেন বা করেছেন, অথবা অমুক পর্যায়ে যে ব্যক্তিই পৌঁছাবে সে ব্যক্তিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অমুক পর্যায়ের ক্ষমতা লাভ করবে....। এ বিষয়ে যা কিছু 'দলীল' পেশ করা হয় সবই ইসলামের বরকতময় যুগগুলির পরে শীয়াদের প্রভাবে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জনশ্রুতি, গল্প-কাহিনী, বিভিন্ন বুজুর্গের নামে প্রচারিত কথাবার্তা ও পরবর্তী যুগগুলির কোনো কোনো আলিমের মতামত মাত্র, যা সবই কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীসের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

ইলম বিষয়ক শিরক

ইলমুল গাইবের দাবি শিরক বা কুফর বলে গণ্য হতে পারে।

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইলমুল গাইব আছে বলে বিশ্বাস করার ভয়াবহতা বর্ণনা করে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাহ) বলেন:

تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر، لقوله تعالى (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ...)

"ভবিষ্যদ্বক্তা বা গণক-জ্যোতিষী গাইবী বিষয়ে যা বলে তা বিশ্বাস করা বা তা সত্য বলে মনে করা কুফ্রী; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন[1]: "বল: আল্লাহ ব্যতীয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে

কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।”মোল্লা আলী কারী,শারহুল ফিকহিল আকবার পৃ.২৪৯

তিনি আরো বলেন:

اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علمهم الله أحياناً. وذكر الحنفية تصريحاً بالتكفير باعتقاد أن النبي (ﷺ) يعلم الغيب؛ لمعارضة قوله تعالى: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ."...(ُ

“জেনে রাখ, নবীগণ (আঃ) অদৃশ্য বা গাইবী বিষয়াদির বিষয়ে আল্লাহ কখনো কখনো যা জানিয়েছেন তা ছাড়া কিছুই জানতেন না। হানাফী মাযহাবের আলিমগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গাইব জানতেন বলে আকীদা পোষণ করা কুফরী, কারণ তা আল্লাহর এ কথার সাথে সাংঘষিক[3]: “বল: আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য (গাইব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।”মোল্লা আলী কারী,শারহুল ফিকহিল আকবার পৃ.২৫৩

ওসীলা বিষয়ক শিরক

ওসীলা বিষয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা সমাজে বিদ্যমান। ওসীলা কখনো ইসলাম নির্দেশিত বা সুন্নাত-সম্মত কর্ম, কখনো সুন্নাত বহির্ভুত বা সুন্নাতের ব্যতিক্রম কর্ম এবং কখনো তা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে বা উলূহিয়্যাতে শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। এজন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মহান গুণাবলি, তাঁর পবিত্র নামসমূহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি ঈমানের ওসীলা দিয়ে সকাতরে আর্জি করি যে, তিনি যেন সঠিকভাবে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করার এবং ব্যাখ্যা করার তাওফীক আমাকে প্রদান করেন।

'ওসীলা' শব্দটির বিষয়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা এর অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন। ভাষাতত্ত্বের সাথে পরিচিত সকলেই জানেন যে, বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটে। সময়ের আবর্তনের কারণে একই ভাষার মধ্যে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আবার এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় গমনের কারণেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন বাংলা ভাষায় এক শতাব্দী আগে 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ ছিল সংবাদ। কিন্তু বর্তমানে শব্দটির অর্থ বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন। কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত আরবী ভাষায় 'লাবান' অর্থ দুধ। কিন্তু বর্তমানে আরব দেশে 'লাবান' অর্থ ঘোল।

ভাষান্তরের কারণে অর্থের পরিবর্তন খুবই বেশি। আরবীতে 'জিনিস' অর্থ শ্রেণী বা লিঙ্গ, কিন্তু বাংলায় 'জিনিস' অর্থ এগুলির কিছুই নয়, বরং বাংলায় এর অর্থ দ্রব্য বা বস্তু। আরবীতে ও ফার্সীতে নেশা বা নাশওয়া অর্থ 'মাতলামী' বা মাদকতা। কিন্তু বাংলায় শব্দটির অর্থ মাদকতা হয় আবার অভ্যস্ততাও হয়। একারণে অনেক সময় আমরা অস্পষ্টতার মধ্যে পড়ে যায়। কেউ বলেন, নেশা হারাম। উত্তরে অন্যে বলেন, ভাত, চা ইত্যাদিও তো নেশা? বস্তুত বাংলা 'নেশা' বা অভ্যস্ততা হারাম নয়, বরং ফার্সী নেশা বা মাতলামী ও মাদকতা হারাম। অভ্যস্ততা হারাম বা হালাল হবে অভ্যাসের বিষয়ের বিধান অনুসারে, আর মাদকতা সর্বাবস্থায় হারাম।

পীর-মাশাইখের ওসীলা

আল্লাহ তাঁর ওসীলা বা নৈকট্য সন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী, তাবিয়ী ও পরবর্তী সকল মুফাস্সির একমত যে, নেক আমল হলো ওসীলা, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। প্রায় হাজার বৎসর যাবৎ এ বিষয়ে অন্য কোনো মতামত প্রচারিত হয় নি। এরপর কোনো কোনো আলিম উল্লেখ করেছেন যে, 'পীর-মাশাইখ'-ও ওসীলা। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কথার প্রেক্ষাপট বুঝা যায়। তাতার আক্রমনে মুসলিম বিশ্ব একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এরপর মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় প্রশাসন, শিক্ষাদীক্ষার উন্নয়ন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে স্থবিরতা আসে। বিশাল মুসলিম বিশ্বের কয়েকটি রাজধানী বাদ দিলে সর্বত্র অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্মের প্রভাব, বাতিনী শীয়াগণের প্রভাব ইত্যাদি কারণে শিরক-কুফর প্রবল হয়ে উঠে। উম্মাতের এ দুর্দিনে সরলপ্রাণ প্রচারবিমুখ সুফী, দরবেশ ও পীর-মাশাইখ আম-জনগনের মধ্যে ইসলামের শিক্ষা বিস্তারে নিরলস চেষ্টা করে যান। তাঁদের সাহচার্যে যেয়ে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত, ঈমান, ইসলাম ও ইসলামের হুকুম আহকাম কমবেশি শিক্ষা লাভ করত এবং আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করত। সাধারণ মানুষদের ঈমান, ইসলাম ও আখলাক গঠনে তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দিকে লক্ষ্য করে কোনো কোনো আলিম মতামত পেশ করেন যে, পীর-মাশাইখের সাহচার্যও একটি বিশেষ নেক আমল যা মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন।

কিন্তু অজ্ঞতার কারণে এবং স্বার্থান্বেষীদের মিথ্যা প্রচারণার কারণে একথাটি ক্রমান্বয়ে শিরকী অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আরবের মুশরিকগণ যেমন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ফিরিশতা, নবী, ওলী ও অন্যান্য উপাস্যের ইবাদত করত, ঠিক তেমনি অনেকে পীর-মাশাইখের ইবাদত করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে মনে করতে থাকে। কেউ বা ওসীলা বলতে 'মধ্যস্থতাকারী' বা উপকরণ বলে মনে করতে থাকে। তারা মনে করতে থাকে যে, পীর-মাশাইখ আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। তাদের মধ্যস্থতা ছাড়া কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি বা রহমত পেতে পারে না। এরূপ অনেক শিরকী ধারণা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ক ধারণাগুলি নিম্নরূপ:

পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একটি ওসীলা মনে করা

এ ধারণাটি মূলত ইসলাম-সম্মত। কুরআন ও হাদীসে নেককার মুমিন-মুত্তাকীগণের সাহচার্য গ্রহণে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ওসীলা অর্থ নেক আমল। আর কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে এরূপ মুত্তাকীগণের সাহচার্য গ্রহণ, সাক্ষাত করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তাদেরকে ভালবাসা এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ নেক-আমল বা ওসীলা।

তবে এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, 'পীর' বলে কোনো বিশেষ পদমর্যাদা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। বরং আলিম, সত্যবাদী, মুত্তাকী, নেককার, সৎকর্মশীল, ফরয ও নফল ইবাদত পালনকারী, সুন্নাতের অনুসারী ইত্যাদি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। পীর নামধারী ব্যক্তির মধ্যে যদি এ সকল বাহ্যিক গুণ বিদ্যমান না থাকে তবে তার সাহচার্য গ্রহণ আল্লাহর নৈকট্য নয়, বরং শয়তানের নৈকট্যের অন্যতম ওসীলা, যদিও এরূপ ব্যক্তি পীর, মুরশিদ, ওলী, বা অনুরূপ কোনো নাম ধারণ করে। আর যদি কুরআন-হাদীসে উল্লেখিত উপর্যুক্ত বাহ্যিক গুণাবলি কারো মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবে তিনি 'পীর' নাম ধারণ করুন আর নাই করুন তার সাহচর্য মহান আল্লাহর নৈকট্যলাভের ওসীলা বলে গণ্য।

দ্বিতীয়ত, মূলত মুমিনের নিজের কর্মই তাঁর অসীলা, অন্য কোনো মানুষ বা তার কর্ম নয়। এখানে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেককার মানুষদের সাহচর্য গ্রহণই নেককর্ম ও অসীলা। ইসলামী অর্থে কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির 'ওসীলা' হতে পারে না, কেবলমাত্র মুমিনের নিজের কর্মই তার ওসীলা। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কোনো ব্যক্তির জন্য ওসীলা হবেন না যতক্ষণ না সে তাঁর উপর ঈমান গ্রহণ করবে এবং তাঁর শরীয়ত পালন করবে। এক্ষেত্রে মূলত মুমিনের ঈমান ও শরীয়ত পালনই ওসীলা। এর কারণে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শাফা'আত, জান্নাতের সাহচার্য ইত্যাদি নসীব করে দিতে পারেন।

পীরের সাহচর্যকে আল্লাহর নৈকট্যের একমাত্র ওসীলা মনে করা

অসীলা বিষয়ক বিভ্রান্তিকর ধারণার একটি হলো, পীরের সাহচার্যকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের একমাত্র ওসীলা বলে মনে করা। অগণিত নফল মুস্তাহাব নেক কর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক-কর্ম হলো নেককার বান্দাদের সাহচার্য গ্রহণ করা। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা অনুসারে ঈমান ও ইসলামের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি আহকাম মেনে চলাই মূল দীন। নেক-সাহচার্য এ সকল ইবাদত পালনে সহায়ক। সর্বদা কুরআন তিলাওয়া ও অধ্যয়ন করা, হাদীস, সীরাত, শামাইল পাঠ করা, সাহাবীগণের জীবনী পাঠ করার মাধ্যমেও প্রকৃত সাহচার্য গ্রহণ করা যায়।

পীরের কর্মকে নিজের ওসীলা বলে মনে করা

এ বিষয়ক অন্য বিভ্রান্তি হলো, পীরের বেলায়াতকে নিজের নাজাতের উপকরণ বলে বিশ্বাস করা। এরূপ বিশ্বাসের কারণে অনেকের ধারণা, আমার নিজের কর্ম যাই হোক না কেন, পীর সাহেব যেহেতু অনেক বড় ওলী, কাজেই তিনি আমাকে পার করিয়ে দিবেন। এরূপ বিশ্বাস কুরআন-হাদীসের নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। প্রথমত, কে বড় ওলী তা নিশ্চিত জানা তো দূরের কথা কে প্রকৃত ওলী বা কে জান্নাতী তাও নিশ্চিত জানার উপায় নেই। আমরা বাহ্যিক আমলের উপর নির্ভর করে ধারণা পোষণ করি এবং সাহচার্য গ্রহণ করি। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারংবার বলেছেন যে, তাঁর সন্তান, আত্মীয়-স্বজন, সাহাবী বা অন্য কাউকে তিনি আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ত্রাণ করতে পারবেন না। প্রত্যেককে তার নিজের নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নাজাত লাভ করতে হবে। মূলত মুমিনের নিজের কর্মই তার নাজাতের ওসীলা। পীরের সাহচর্য থেকে মুমিন আল্লাহর পথে চলার কর্ম শিক্ষা করবেন, প্রেরণা লাভ করবেন এবং নিজে আমল করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবেন।

এ বিশ্বাসের ভিত্তি হলো যে, মহান আল্লাহ কাউকে শাফা'আত করার উন্মুক্ত অনুমতি বা অধিকার দিয়েছেন বা দিবেন, তিনি নিজের ইচ্ছামত কাফির-মুশরিক, ফাসিক-খোদদ্রোহী যাকে ইচ্ছা ত্রাণ করবেন। বস্তুত কারো সুপারিশ আল্লাহ শুনবেনই বা আল্লাহ তাকে ইচ্ছামত সুপারিশ করা অধিকার দিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের ক্ষমতায় শিরক করা। এ বিশ্বাসটি মূলত আরবের মুশরিকদের 'শাফা'আত' বিষয়ক বিশ্বাসের মত।

ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা

ওসীলা বিষয়ক আরেকটি বিভ্রান্তি হলো ওসীলা অর্থ উপকরণ বলে মনে করা। কুরআনে মুমিনকে নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আল্লাহর পথে কোনো অতিরিক্ত উপকরণ তালাশ করতে বলা হয় নি। উপকরণ দু প্রকারের: জাগতিক ও ধর্মীয়। জাগতিক উপকরণ সকলেই জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে জানে। যেমন ভাত সিদ্ধ হওয়ার উপকরণ পানি ও আগুণ, বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার উপকরণ মাটি, পানি ও আলো। আর ধর্মীয় উপকরণ একমাত্র ওহীর মাধ্যমে জানা যায়। যেমন ওযূ করা সালাত কবুল হওয়ার উপকরণ, ঈমান বিশুদ্ধ হওয়া নেক আমল কবুল হওয়ার উপকরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও মানুষের উপকার করা রিযক বৃদ্ধির উপকরণ। পীরের সাহচর্য লাভ, মুরীদ হওয়া ইত্যাদি কোনো নেক আমল কবুল হওয়া, দু'আ কবুল হওয়ার উপকরণ নয়। কারণ কুরআন-হাদীসে কোথাও তা বলা হয় নি। এরূপ ধারণা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলা এবং তা পরবর্তী শিরকী বিশ্বাসগুলি পথ উন্মুক্ত করে।

পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী মনে করা

ওসীলা বিষয়ক শিরকী বিশ্বাসের অন্যতম হলো পীরকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী বলে মনে করা। দুভাবে এ বিশ্বাস 'প্রমাণ' করা হয়: প্রথমত কুরআনের অর্থ বিকৃত করা এবং দ্বিতীয়ত আরবের মুশরিকদের মত 'যুক্তি' পেশ করা। প্রথম পর্যায়ে সরলপ্রাণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করতে এরা সাধারণত বলে থাকে 'আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ওসীলা ধরে তাঁর কাছে যেতে, কাজেই সরাসরি তাকে ডাকলে হবে না। আগে ওসীলা ধরো।' এভাবে তারা কুরআনের আয়াতকে বিকৃত করেন। বিকৃতির মূল ভিত্তি ওসীলা শব্দের অর্থের পরিবর্তনের মধ্যে। কুরআনের ভাষায় ওসীলা অর্থ নৈকট্য এবং অসীলা সন্ধানের অর্থ মুমিনের নিজের নেক কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য সন্ধান। আর এরা বুঝান ওসীলা অর্থ মধ্যস্থতাকারী।

দ্বিতীয় পর্যায়ে এরা যুক্তি দেন যে, পৃথিবীতে যেমন রাজা-বাদশাহর দরবারে যেতে মন্ত্রী বা আমলাদের সুপারিশ, মধ্যস্থতা ও রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন, তেমনিভাবে আল্লাহর দরবারেও পীর বা ওলীগণের রিকমেন্ডেশন প্রয়োজন। পীর, বা ওলীর সুপারিশ বা রিকমেন্ডেশন ছাড়া কোনো দু'আ আল্লাহ কবুল করেন না। বান্দা যতই আল্লাকে ডাকুক বা ইবাদত করুক,

যতক্ষণ না তা 'যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে' অর্থাৎ পীরের রিকমেন্ডেশন সহ তাঁর দরবারে যাবে ততক্ষণ তা গ্রহণ করা হবে না। অথবা পৃথিবীর বিচারালয়ে যেমন উকিল-ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারে পীর ও ওলীগণ উকিল-ব্যরিষ্টারি করে মুরিদ-ভক্তদের পার করে দিবেন। এ জাতীয় ধারণাগুলি সবই আরবের মুশরিকদের বিশ্বাসের অনুরূপ এবং সুস্পষ্ট শিরক।

(ক) আমরা দেখেছি যে, এগুলি সবই আরবের মুশরিকদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ছিল তাদের সকল শিরকের মূল।

(খ) এ সকল চিন্তা সবই মহান আল্লাহর নামে মিথ্যাচার। মহান আল্লাহ কোথাও ঘুনাক্ষরেও বলেন নি যে, তাঁর কাছে যেতে বা দু'আ কবুল হতে কখনো কারো সুপারিশ লাগবে। বরং বারংবার বলেছেন যে, তিনি বান্দার সবচেয়ে কাছে এবং বান্দা ডাকলেই তিনি শুনেন ও সাড়া দেন।

(গ) জাগতিক রাজা-বাদশাহর দরবারে বাইরের অপরিচিত কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ দরকার হয়, তার নিজের দরবারের বা চাকরদের কেউ গেলে তার জন্য সুপারিশ বা অনুমতির দরকার হয় না, কারণ তিনি নিজেই তাকে ভালভাবে চেনেন। আল্লাহর সকল বান্দাই তাঁর দরবারের আপনজন। কাজেই এক চাকরকে দরবারে যেতে আরেক চাকরের অনুমতি বা সুপারিশ লাগবে কেন?

(ঘ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ তার দেশের সবাইকে চেনেন না। যে ব্যক্তি তার দরবারে কিছু প্রার্থনা করতে গিয়েছে সে কি প্রতারক, মিথ্যবাদী না সত্যবাদী তা তিনি জানেন না। এজন্য তাকে আমলাদের সুপারিশের উপর নির্ভর করতে হয়। মহান আল্লাহ কি এরূপ? কোনো বান্দার বিষয়ে কোনো পীর, ওলী কি মহান আল্লাহর চেয়ে বেশি জানেন?

(ঙ) জাগতিক রাজা-বাদশাহ ক্রোধ-বশত হয়ত প্রজার উপর কঠোরতা করতে পারেন, এক্ষেত্রে মন্ত্রী-আমলাদের সুপারিশ তার ক্রোধ সম্বরণ করতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ কি তদ্রূপ? মহান আল্লাহর দয়া বেশি না পীর-ওলীগণের দয়া বেশি?

(চ) জাগতিক বিচারালয়ে বিচারক জানেন না যে, সম্পত্তিটি কার পাওনা। উকিল-ব্যারিষ্টার সত্য বা মিথ্যা যুক্তি-তর্ক ও আইনের ধারা দেখিয়ে বিচারককে বুঝাতে চেষ্টা করেন। মহান আল্লাহ কি তদ্রূপ? উকিল সাহেবরা কি মহান আল্লাহকে অজানা কিছু জানাবেন? নাকি তাকে ভুল বুঝিয়ে মামলা খারিজ করে আনবেন? কুরআন কারীমে আল্লাহ বারংবার বলেছেন যে, উকিল হিসেবে তিনিই যথেষ্ট এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উকিল ধরতে নিষেধ করেছেন।

(ছ) মহান আল্লাহকে মানুষের সাথে বা মানবীয় রাজা-বাদশাদের সাথে তুলনা করা সকল শিরকের মূল। মহান আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা ছাড়া এগুলি কিছুই নয়।

মধ্যস্ততাকারীকে উলূহিয়্যাতের হক্কদার মনে করা

আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নামে ফিরিশতা ও নবী-ওলীগণের ইবাদত করা হলো আরবের মুশরিকদের অন্যতম শিরক যা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবাদত অর্থ চূড়ান্ত ও অলৌকিক ভক্তি, বিনয় ও অসহায়ত্ব প্রকাশ। এরূপ অনুভূতি নিয়ে পীর-ওলীকে সাজদা করা, তাঁর নাম যপ করা, বিপদে আপদে দূর থেকে তাঁকে ডাকা, তার কাছে ত্রাণ চাওয় ইত্যাদি এ পর্যায়ের শিরক।

শিরকের সেকাল ও এ কাল বা বর্তমান

শিরক বিষয়ক আলোচনা থেকে আমরা কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের শিরকের সাথে মুসলিম সমাজের শীয়াগণ ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত বা অজ্ঞতা, পূর্ববর্তী বা পার্শবর্তী ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত শিরকে লিপ্ত মানুষদের চিন্তা, যুক্তি ও কর্মের মধ্যে আমরা অদ্ভুৎ মিল দেখতে পাই।

(১) সকলেই আল্লাহকে একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করেন। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো ক্ষমতা নেই বলে স্বীকার করেন।

(২) সকলেরই শিরকের ভিত্তি এই যে, মহান আল্লাহ তাঁর কিছু বান্দাকে বিশেষভাবে ভালবেসে তাঁদেরকে কিছু অলৌকিক মঙ্গল-অমঙ্গলের ক্ষমতা দিয়েছেন এবং তাদের সুপারিশ তিনি ফেলেন না। এরূপ বান্দাদের ডাকলে তাঁরা তা শুনতে ও জানতে পারেন এবং নিজেদের ক্ষমতায় বা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। এদের ডাকলে আল্লাহ খুশি হন এবং এদের ডাকলে এরা বান্দাকে আল্লাহ বেলায়াত বা নৈকট্য লাভ করিয়ে দেয়।

(৩) আল্লাহর 'প্রিয় বান্দা' নির্ধারণও সকলের ক্ষেত্রে একইরূপ: ওহীর মাধ্যমে পরিজ্ঞাত কিছু সত্যিকার আল্লাহর প্রিয় বান্দার পাশাপাশি অনেক কল্পিত ব্যক্তিত্বকে এরা 'আল্লাহর প্রিয়' বলে দাবি করে।

(৪) সকলেরই দলীল দু'আ ও শাফা'আত বিষয়ক ওহীর নির্দেশনার বিকৃতি, মুজিযা বিষয়ক ভুল ধারণা, কিছু যুক্তি, কল্পনা, দাবি এবং লোকাচার।

(৬) আমরা দেখেছি যে, মহান আল্লাহ বলেন: "বল, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে তা আমাকে দেখাও, অথবা আকাশমন্ডলীর সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে কি? না কি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি (ওহীর জ্ঞান দান করেছি) যার প্রমাণের উপর তারা নির্ভর করে? বস্তুত জালিমরা একে অপরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে।"

(৭) সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি, বিবেক ও যুক্তির তো দাবি এই যে, যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক তাকেই একমাত্র ডাকতে হবে এবং ইবাদত করতে

হবে। এখন প্রশ্ন হলো, নবীগণ, ফিরিশতাগণ, সত্যিকার বা কাল্পনিক ওলীগণ বা কাল্পনিক দেব-দেবিগণ যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক বানিয়ে বিপদে আপদে আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকা হয় তাদের ডাকার পিছনে যৌক্তিকতা বা দলিল কি? এদের মধ্যে যারা ফিরিশতা, নবী বা সত্যিকার নেককার মানুষ তাঁদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করতে হবে। কিন্তু তাদেরকে ডাকতে হবে কেন? তাদের নামে মানত করতে হবে কেন? তারা কি বিশ্বের কোনো কিছু সৃষ্টি করেছেন? সকলেই একবাক্যে স্বীকার করছে যে, তারা কোনোকিছুই সৃষ্টি করেন নি, বরং মহান আল্লাহই মহাবিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। এতে স্বাভাবিক বিবেক ও বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো জ্ঞানী মানুষ স্বীকার করবেন যে, মহান আল্লাহই যেহেতু একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা বা বিপদে আপদে অন্য কাউকে ডাকা বিবেক-বিরুদ্ধ ও অর্থহীন।

মুসলিম সমাজের যাদের ইবাদত করা হয় বা বিপদে আপদে যাদের ডাকা হয় যেমন আলী (রাঃ), ফাতিমা (রাঃ), পাক-পাঞ্জাতন, আলী বংশের ইমামগণ, 'গাওস', 'কুতুব' বা অন্যান্য নামে পরিচিত বিভিন্ন ওলী-আল্লাহগণ এদের বিষয়েও একই প্রশ্ন এবং উত্তরও একই।এ

(৭) এরপর ওহীর প্রমাণ চাওয়া হয়েছে। যুক্তি ও বিবেকের দাবি যে, একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালককেই ইবাদত করতে হবে। তবে তিনি যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেন যে, আমার ইবাদতের প্রয়োজন নেই, আমার নৈকট্য পেতে হলে আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বদের ইবাদত কর, তারা তোমাদেরকে আমার নৈকট্য পাইয়ে দেবে, অথবা আমার কাছে সরাসরি কিছু চাইলে তা পাওয়া যাবে না, বরং আমার প্রিয় বানদাদের নিকট তোমাদের আব্দার পেশ করবে, তারা আমার কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। যদি এরূপ কোনো নির্দেশ তিনি সুস্পষ্টভাবে দিতেন তবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকার, মানত করার বা সাজদা করার বৈধতা প্রমাণিত হতো। কিন্তু কখনোই মুশরিকগণ এরূপ কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেন নি। কুরআনে এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বারংবার বলা হয়েছে যে, আল্লাহর সাথে শিরক করো না, যে বিষয়ে তিনি কোনো 'সুলতান' বা সুস্পষ্ট প্রমাণ নাযিল করেন নি। আর আল্লাহর সাথে শিরক করার মত যুক্তি, বিবেক ও ওহী বিরুদ্ধ কাজ ওহীর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছাড়া করার অর্থ আল্লাহর নির্দেশের সাথে কুফরী করা।

(৮) মুসলিম সমাজের যে সকল মানুষে শিরকে লিপ্ত তাদের অবস্থাও একই। তারা কখনোই কুরআন-হাদীস থেকে একটি নির্দেশনাও দেখাতে পারেন না যে, মহান আল্লাহ তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকতে, সাহায্য চাইতে, সাজদা করতে, অন্য কারো নামে মানত, উৎসর্গ করতে বা অন্য কাউকে ইবাদত করতে কোনোরূপ নির্দেশ বা অনুমতি দিয়েছেন। কিছু বিকৃতি, অপব্যাখ্যা, যুক্তি, কল্পনা বা গল্পকাহিনী তাদের সম্বল।

(৯) সবশেষে তাদের শিরকের প্রকৃত অবস্থা মহান আল্লাহ জানিয়েছেন। বস্তুত মুশরিকগণ একে অপরকে তাদের মিথ্যা কল্পনা ভিত্তিক প্রসূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তোমরা এদের ইবাদত কর, এদের কাছে প্রার্থনা কর, এদেরকে ডাক, এরা তোমাদের ত্রাণ করবে, আখিরাতে মুক্তি দেবে ইত্যাদি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই তাদের একমাত্র সম্বল। এর পাশাপাশি জিন ও মানুষ শয়তানের প্রচারিত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী: ‘‘অমুক বিপদে পড়ে বাবা অমুক, মা অমুক, সেন্ট বা সান্তা অমুককে ডেকেছিল, অমনি সে তাকে উদ্ধার করে দিয়েছে।’’ এগুলিই মুশরিকদের সম্বল।

(১০) মুসলিম কেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডাকবেন? মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি সবকিছু দেখেন, জানেন, শুনেন। তিনি দয়াময় এবং তিনি বান্দাকে তার মায়ের চেয়েও ভালবাসেন। তিনি প্রদান করলে কেউ ঠেকাতে পারে না এবং তিনি ঠেকালে কেউ দিতে পারে না। তাঁকে ডাকলে এবং তাঁর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন এবং এবং সাড়া দেন। তাহলে আমি কেন তাকে ছেড়ে অন্যকে ডাকব? আমরা প্রতিদিন বারংবার ‘ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তা‘ঈন’ (إياك نعبدُ وإياك نستعين) বলে ঘোষণা করি যে: একমাত্র তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য চাই। তবে কেন আমরা অন্যকে ডাকব? মহান আল্লাহ বারংবার বলেছেন একমাত্র তাঁকেই ডাকতে। এর বিপরীতে কোথাও তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে অনুমতি দেন নি। এরপরও আমরা কেন অন্যকে ডাকব বা অন্যের কাছে ত্রাণ চাইব?

(১১) তাবিল-ব্যাখ্যা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) নির্দেশ অমান্য করা হলো ইবলিসের প্রতারণার মূল সূত্র। মহান আল্লাহ বলেন:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ

''অতঃপর শয়তান তাদের গোপনকৃত লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই শুধু তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলে যে, আমি অবশ্যই তোমাদের একজন হিতাকাংক্ষী।''সূরা আরাফ আয়াত২০-২১.

এখানে শয়তান আদম ও হাওআ (আঃ)-কে এ কথা বলে নি যে, আল্লাহর আদেশ মানার দরকার নেই। বরং সে বলেছে যে, আল্লাহর আদেশ অবশ্যই মানতে হবে, তবে আল্লাহর আদেশের 'ইল্লাত' কারণ, হেকমত ও রহস্যটা জানতে হবে এবং সে অনুসারে কাজ করতে হবে। এখানে আল্লাহ তোমাদেরকে ফল খেতে নিষেধ করেছেন কারণ এ ফল খেলে তোমরা ফিরিশতা হয়ে যাবে এবং জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। এখন যদি তোমরা জান্নাতে স্থায়ী থাকতে চাও তবে এ ফল খেতে পার। পাশাপাশি সে আল্লাহর কসম করে বলে যে, কেবলমাত্র তাদের ভালর জন্যই সে কষ্ট করে এ বুদ্ধি দিয়েছে....।

সকল যুগেই শয়তান এভাবেই আদম সন্তানদেরকে প্রতারণা করছে। মহান আল্লাহ সকল বিপদে আপদে একমাত্র তাঁকে ডাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেছেন। এখন শয়তান বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বলছে, অমুক তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। শিরকের পথ রোধ করতে কবর পাকা করতে, কবররে উপর ঘর বা গম্বুজ বানাতে, কবর উচু করতে, কবরে কিছু লিখতে কবরের নিকট মসজিদ বানাতে, কবরে বাতি দিতে নিষেধ করেছেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এর বিপরীতে কখনোই এরূপ কোনো কাজ করতে নির্দেশ বা উৎসাহ দেন নি। এখন শয়তান বলছে, অমুক বা তমুক কারণে তা নিষেধ এবং অমুক বা তমুক কারণে তা করা যেতে পারে। সকল শিরক, কুফর ও বিদ'আতের ক্ষেত্রেই শয়তানের মূল যুক্তি এটাই। এ বিষয়ে মুমিনকে সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ নির্দ্বিধায় আক্ষরিকভাবে পালনই নাজাতের পথ।

মুসলিম সমাজে শির্ক প্রবেশের প্রেক্ষাপট

মুসলিম সমাজে শিরকের অনুপ্রবেশ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী

সত্য ও মিথ্যার সংঘাতের সবচেয়ে বড় বিষয় তাওহীদ ও শিরকের সংঘাত। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষদেরকে তাওহীদের পথ দেখিয়েছেন। শয়তান ও তার অনুসারিগণ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে আবার তাদেরকে শিরকের মধ্যে নিপতিত করতে। মানবীয় দুর্বলতা, তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ওহীর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় মুমিনকে শয়তানের ক্ষপ্পরে পড়তে সাহায্য করেছে।

তাওহীদের বিশ্বজনীন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাও'আত। কুরআন ও সুন্নাহে তাওহীদকে সমুন্নত রাখার ও শিরক-কুফর প্রতিরোধ করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমরা দেখেছি। কিন্তু শয়তানের প্রচেষ্টা তাতে থেমে যায় নি। শয়তান তার অনুসারীদের নিয়ে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে শিরক-কুফর প্রবেশ করাতে। বিশেষ করে যখনই কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা সমাজ কুরআন ও সহীহ হাদীসের জ্ঞান থেকে দূরে সরে গিয়েছে তখনই শয়তানের প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে কিছুটা হলেও সফলতা লাভ করেছে।

বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে সতর্ক করেছেন যে, পূর্ববর্তী উম্মাতগুলি যেমন বিভ্রান্ত হয়েছে, তাঁর উম্মাতের মধ্যেও অনুরূপভাবে একই প্রকৃতির বিভ্রান্তি প্রবেশ করবে। এ বিষয়ক কিছু হাদীস আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি। এ বিষয়ক অনেক হাদীস আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাব, ইনশা আল্লাহ। এ সকল হাদীস থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, ইহূদী, খৃস্টান, পারস্যের অগ্নি-উপাসক ও অন্যান্য বিভ্রান্ত জাতি যেভাবে আসমানী হেদায়াত পাওয়ার পরেও শিরক-কুফর ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হয়েছিল অবিকল সেভাবে মুসলিম উম্মাহর অনেকে শিরক-কুফর ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত হবে। পার্থক্য এই যে, মুসলিম উম্মাহর মূল দীন বিনষ্ট হবে না, মহান আল্লাহ এর মূল উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে বিশুদ্ধভাবে হেফাযত করবেন এবং উম্মাতের মধ্যে কিছু মানুষ সর্বদা হক্কের উপর থাকবেন, যারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবীগণের সুন্নাত হুবহু অনুসরণ করবেন।

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَتْ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ

"কিয়ামতের পূর্বেই দাওস গোত্রের নারীদের নিতম্ব 'যুল খালাসাহ'-র আশেপাশে আন্দোলিত হবে", যুল খালাসাহ ছিল তাবালায় অবস্থিত দাওস গোত্রের একটি প্রতিমা যা তারা জাহিলী যুগে ইবাদত করত।"বুখারী আস সহীহ ৬/২৬০৪

সাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ

"কিয়ামতের পূর্বেই আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিশে যাবে এবং আমার উম্মাতের কিছু সম্প্রদায় 'ওয়াসান' 'পূজিত দ্রব্যের' ইবাদত করবে।"ইবনু মজাহ২/১৩০৪

সুতরাং মুর্তিপূজা, দ্রব্য পূজা, স্মৃতি-বিজড়িত স্থান বা বস্তু পূজার মত শিরকও মুসলিম উম্মাতের কারো কারো মধ্যে প্রবেশ করবে। বাস্তব অবস্থাও তাই সাক্ষ্য দেয়।

ইহূদী ষড়যন্ত্র ও শীয়া মতবাদ

বস্তুত মুসলিম সমাজের সকল শিরক, কুফর ও বিভ্রান্তির মূল ইহূদী আন্দোলন, যেমন খৃস্টান ধর্মের বিকৃতির মূল কারণ ইহূদী আন্দোলন। ইহূদী পৌল যেমন কাশফ, কারামত ইত্যাদির দাবি করে খৃস্টান সেজে ক্রমান্বয়ে খৃস্টান ধর্মকে বিকৃত করে, তেমনি আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা

মুসলিম সেজে ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিশ্বাস বিকৃত করে। পৌল যিরুশালেমের হাওয়ারী ও ইসরায়েলীয় খৃস্টানদের মধ্যে সুবিধা করতে না পেরে 'পরজাতিদের' নিকট গমন করে। ইবনু সাবা মদীনা-মক্কায় সুবিধা করতে না পেরে কুফা, বসরা, মিসর ইত্যাদি দূরবর্তী অঞ্চলে নতুন প্রজন্মের নও মুসলিমদের নিকট গমন করে। উভয়েরই দাবি দাওয়ার ভিত্তি 'অতিভক্তি'র মাধ্যমে মুক্তি। তবে পৌল খৃস্টধর্মের মূল উৎসগুলি বিকৃত করতে সক্ষম হয়, ফলে মূল খৃস্টধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইবনু সাবা এরূপ কিছু করতে সক্ষম হয় না। সে অগণিত মিথ্য কথা প্রচার ও প্রসার করে যায় এবং কুরআন ও সুন্নাহ যেন কেউ গ্রহণ না করে তার ব্যবস্থা করে যায়। তবে সে মূল কুরআন ও সুন্নাহকে বিকৃত করতে পারে নি।

মুসলিম উম্মাহর সকল শিরক-এর উৎস আব্দুল্লাহ ইবনু সাবা এবং তার প্রচারিত শীয়া মতবাদ। দ্বাদশ ইমাম পন্থী শীয়া এবং বিশেষ করে বাতিনী শীয়া. কারামিতা, নুসাইরিয়্যাহ, দুরুয ইত্যাদি সম্প্রদায় অগণিত শিরক-কুফর মুসলিম সমাজে ছাড়িয়েছে। বিশেষত ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী গত হওয়ার পরে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ সকল বিভ্রান্ত দল রাষ্টীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। বাগদাদে মূল কেন্দ্রে বনূ বুওয়াইহিয়া শীয়াগণ ক্ষমতা দখল করে। কারামাতিয়্যা, বাতিনীয়া, হাশাশিয়া, ফাতিমীয়া বিভিন্ন শীয়া সম্প্রদায় মিসর, তিউনিসিয়া, মরক্কো, ইয়ামান, কূফা, বসরা, নজদ, খুরাসান, ভারত, বাংলা ইত্যাদি অঞ্চলে রাষ্ট ক্ষমতা দখল করে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এরা সাধারণ সরলপ্রাণ 'সুন্নী' মুসলিম, সূফী, দরবেশ ও ইলম-হীন নেককার মানুষদের মধ্যেও এদের শিরক প্রসার করতে সক্ষম হয়। মুসলিম উম্মাহর সকল শিরকের উৎস মূলত এখানেই।

ঈমানের উৎসের বিচ্যুতি ও অতিভক্তি

শিরক প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল এ মতবাদে আকীদার উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্তি এবং ইমামগণ ও ওলীগণের বিষয়ে অতিভক্তি।

তারা বিশ্বাসের উৎস ওহীর মধ্যে বা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে নি। বরং ওহীর তাফসীরে তাদের 'আলিম' বা ইমামদের ব্যাখ্যাকেই ওহীর মর্যাদা দিয়েছে। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পরে ইমাম, ইমামগণের খলীফা বা ফকীহ নামে বিভিন্ন মানুষের মতামতকেও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এভাবে মূলত তারা কুরআন বা ওহীর কার্যকরিতাই অস্বীকার করেছে। তাদের মতে কুরআনের অর্থ বুঝা সাধারণ মানুষের কাজ নয়। কুরআনের সরল যে অর্থ বুঝা যায় তাও কোনো গুরুত্ব বহন করে না। বরং কুরআনের তাফসীরে ইমামগণ বা তাদের প্রতিনিধি বুজুর্গগণ যা বলেছেন সেটাই চূড়ান্ত। এছাড়া তারা প্রচার করে যে, ইমামগন ও তাদের প্রতিনিধিগণ কাশফ, ইলহাম ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে যে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। এ জ্ঞানই মূলত দীনের মূল। তাদের কথা ও ব্যাখ্যার আলোকেই কুরআনের নির্দেশাবিল গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

স্বভাবতই তারা এ সকল শিরকী বিশ্বাসের পক্ষে কুরআন থেকে কোনো দলীল পেশ করতে পারে না। সহীহ হাদীস তো দূরের কথা তাদের মধ্যে প্রচলিত হাদীস থেকেও তারা কোনো দলীল পেশ করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন ইমামের নামে প্রচলিত জাল কথা, কুরআনের তাফসীর নামে প্রচলিত বিভিন্ন আলিমের মতামত, বিভিন্ন আলিমের কাশফ, ইলহাম, ইলকা ইত্যাদিকে তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। বস্তুত, ঈমানের উৎস থেকে একবার মুমিনকে বিচ্যুত করতে পারলে তাকে সবই গেলানো সম্ভব।

শীয়াগণের প্রভাবাধীন সমাজগুলিতে বসবাসরত 'সুন্নী' মুসলিমও তাদের এ সকল আকীদা দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। বিশেষত ক্রুসেড যুদ্ধ ও তাতার আক্রমনের পরে ছিন্নভিন্ন মুসলিম সমাজে ইলম ও আলিমগণের কমতির কারণে এ সকল শিরকী আকীদা প্রসার লাভ করতে থাকে।

শিরককে বৈধতা দানের প্রবণতা

আমরা দেখেছি যে, ইহূদী, খৃস্টান এবং মুশরিকগণ ফিরিশতাগণ, নবীগণ, জিন্নগণ ও প্রকৃত বা কাল্পনিক ওলীগণের ইবাদত করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ সকল বান্দাকে মহান আল্লাহ কিছু 'ক্ষমতা' প্রদান করেছেন। এদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হয়। এদের সুপারিশ আল্লাহ শুনেন। এরূপ রুবূবিয়্যাতের শিরকের ভিত্তিতে তারা ইবাদতের শিরক করত। তারা সাধারণ বিপদ আপদ ও প্রয়োজনে এদেরকে ডাকত, এদের কাছে সাহায্য ও ত্রাণ প্রার্থনা করত, এদের নামে মানত, নযর, উৎসর্গ, কুরবানী ইত্যাদি করত, এদের মুর্তি বা স্মৃতিবিজড়িত স্থানে সাজদা করত, এদের উপর তাওয়াক্কুল করত, ভয়, ভালবাসা, আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে তারা শিরক করত।

ইহূদী ষড়যন্ত্রকারী এবং তাদের অনুসারী এ সকল বিভ্রান্ত শীয়া সম্প্রদায়ের মানুষেরা অবিকল একই যুক্তিতে এবং একই প্রকারের শিরক মুসলিম সমাজে প্রচলন করে। তবে স্বভাবতই তারা তাদের অনুসারীদের বুঝান যে, এ সকল বিষয় কখনোই শিরক নয়। বরং এগুলি নবী, নবী বংশের মানুষদের ও ওলীদের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন মাত্র। আর যারা এভাবে নবী-পরিবার, ইমামগণ বা ওলীগণের বিষয়ে 'শুভধারণা' পোষণ করে না, তাদের ডাকে না বা তাদের মাধ্যমে ছাড়া সরাসরি আল্লাহকে ডাকে তারা বেয়াদব ও নবী-বংশের অবমাননাকারী।

শিরকী কর্মগুলির পক্ষে তাদের কেউ বলতে থাকেন যে, আল্লাহকে যতক্ষণ রাববুল আলামীন বা একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করছে ততক্ষণ তাকে মুশরিক বলা যায় না। কেউ বলেন, নবী-বংশের ইমামগণ বা ওলীগণকে তো এরা স্রষ্টা বা প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করে না, এরা স্বয়ং কোনো ক্ষমতা রাখেন তাও বলে না। বরং তারা বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহর ক্ষমতাতেই তারা ক্ষমতাবান এবং আল্লাহই তাদের এরূপ ক্ষমতা দিয়েছেন। কাজেই এ বিশ্বাস শিরক নয়। আমরা দেখেছি যে, এগুলি যদি শিরক না হয় তবে ইহূদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকদেরকেও মুশরিক বলা যায় না। তারা সুস্পষ্টভাবেই মহান আল্লাহকে একমাত্র প্রতিপালক ও সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করত এবং শরীকগণকে আল্লাহই ক্ষমতা দিয়েছেন বলে দাবি করত। কিন্তু কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং প্রচলিত বিভিন্ন মতামতের প্রাধান্যের কারণে অনেকেই এরূপ মত প্রকাশ করেছেন।

অনেকে বলেছেন যে, এরা যখন ইমামগণ বা ওলীগণকে ডাকে বা তাদের কাছে গাইবী সাহায্য চায় তখন মূলত আল্লাহর কাছেই চায়, এ সকল নেক মানুষের নাম নিয়ে মূলত এদের ওসীলা দিয়ে তারা আল্লাহর কাছে চায়। আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, কারো ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাওয়া আর কারো কাছে চাওয়ার মধ্যে আসমান ও জমিনের পার্থক্য। কেউ যদি বলে, হে আল্লাহ, আলী (রাঃ) বা অমুকের ওসীলায় আপনি আমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিন, তবে সে মূলত আল্লাহর নিকটেই চাচ্ছে, ওসীলা পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। আর যে বলছে, হে আলী, হে আবুল খামীস, হে আববাস, হে অমুক আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, সে মূলত তার আহবানকৃত ব্যক্তিকে গাইবী জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করছে তার ইবাদত করছে।

সুন্নাতই নাজাতের একমাত্র সুনিশ্চিত পথ

বস্তুত, মুমিনের নাজাতের একটিই পথ, তা হলো, কুরআন ও সুন্নাতের পথে ফিরে আসা। বিশ্বাসে, কর্মে ও কথায় সুন্নাত ও সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণই নাজাতের একামত্র সুনিশ্চিত পথ।

শিরকের কর্ম সমূহ র বিবরন

কোন্ কোন্ বিশ্বাস বা কর্ম করে অন্যান্য জাতির মানুষেরা মুশরিকে পরিণত হয়েছে তা কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেন কোনো মুমিন কোনোভাবে এরূপ কর্মের মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত না হয়। পূর্ববর্তী জাতিগণের শিরক ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইবাদতে। তাওহীদুর রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শিরক ছিল কম।

প্রতিপালনের শিরক

শিরক ফির রুবূবিয়্যাহ বা প্রতিপালনের শিরক ছিল আরবের মুশরিকদের মধ্যে কিছু প্রচ্ছন্ন। সাধারণভাবে তারা মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের একত্ব একবাক্যে স্বীকার করত। তবে তারা বিশ্বাস করত যে, মহান আল্লাহ দয়া করে কিছু বান্দার প্রতি খুশি হয়ে তাদেরকে বিশ্বের পরিচালনা বা নিষ্ট-অনিষ্টের কিছু ক্ষমতা দিয়েছেন। এজাতীয় আরো কয়েক প্রকার শিরক তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

প্রকৃতিবাদিতা বা জড়বাদিতা

আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আরবের কাফিরগণ মহান আল্লাহকে একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে বিশ্বাস করত। কিন্তু তাদের অনেকেই আখিরাতে বিশ্বাস করত না। তাদের বিশ্বাস অনেকটা এরূপ ছিল যে, মহান আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছেন, মানুষ যুগের আবর্তনে মরে শেষ হয়ে যায়। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে এদের বিভ্রান্তি আলোচনা ও অপনোদন করা হয়েছে। একস্থানে মহান আল্লাহ বলেন:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ

“তারা বলে, ‘একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি, আর কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে।’ বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল ধারণার উপর নির্ভর করে।”সূরা জাসিয়া আয়াত ২৪.

এরূপ কুফরী বা অবিশ্বাসও শিরক। কারণ এরূপ বিশ্বাস পোষণকারী প্রকৃতি বা যুগের আবর্তনকেই ‘রাবব’ বা মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের গুণধারী বলে বিশ্বাস করছে।

আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার দাবি

কুরআনের বর্ণনা অনুসারে আমরা দেখি যে, মুশরিকগণ যাদেরকে ‘আল্লাহর বিশেষ বান্দা’ বা বিশেষ সুযোগ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত সৃষ্টি বলে বিশ্বাস করত তাদের কাউকে কাউকে আল্লাহর কন্যা বা আল্লাহ পুত্র বলে আখ্যায়িত করত। প্রাচীনকাল থেকেই মুশরিকগণ বিভিন্ন যুক্তিতে আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে ‘আল্লাহর সন্তান’, ‘আল্লাহর পুত্র’, ‘আল্লাহর কন্যা’, ‘আল্লাহর বংশধর’ বা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করত। যেমন মুশরিকগণ মালাইকা বা ফিরিশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে বিশ্বাস করত এবং জিন্নদেরকে আল্লাহর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে বিশ্বাস করত। এছাড়া কোনো কোনো ইহূদী ‘উযাইর’ (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। আর খৃস্টানগণ ঈসা মাসীহ (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করত। সাধারণত পুত্রত্ব বা সন্তানত্ব দ্বারা তারা একটি বিশেষ সম্পর্ক বুঝাতো যা অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান নয়। এগুলি সবই মহান আল্লাহর মর্যাদার পরিপূর্ণতার সাথে সাংঘর্ষিক শিরকী বিশ্বাস। কুরআন কারীমে বারংবার এগুলির প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং এরূপ বিশ্বাসের অযৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করা হয়েছে।

আল্লাহর ইলমুল গাইবে শিরক

মুশরিকদের শিরকের অন্যতম একটি প্রকাশ ছিল মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কারো ‘ইলমুল গাইব’ অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের বা ভবিষ্যতের জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা।

এখানে লক্ষণীয় যে, মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের অন্যতম দিক তাঁর অনন্ত-অসীম অতুলনীয় ও সামগ্রিক ইলম বা জ্ঞান। তাঁর অন্যতম সিফাত হলো ‘আলিমুল গাইব’ বা ‘অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী’ এবং ‘আলিমুল গাইব ওয়াশ শাহাদাহ’ বা ‘দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী’। কুরআন কারীমে একথা বলা হয় নি যে, মহান আল্লাহর মত গাইবী ইলম কারো নেই, বরং বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাইবের জ্ঞানই আল্লাহ ছাড়া কারো নেই। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে গাইবের জ্ঞান তার নবী-রাসূলদের প্রদান করেন। এছাড়া উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী-রাসূলসহ সমগ্র সৃষ্টিকে অতি সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।

বান্দার জ্ঞান উপকরণের অধীন। জাগতিক বা আত্মীক উপকরণের মাধ্যমে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, যুক্তি, ওহী ইত্যাদির মাধ্যমে বান্দা জ্ঞান লাভ করে। ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য জাগতিক উপকরণ সকল মানুষের জন্য সমান। আর ওহী, ইলহাম ইত্যাদি মহান আল্লাহ দয়া ও পছন্দ করে কোনো বান্দাকে দিতে পারেন। এগুলি একান্তই মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন, বান্দার ইচ্ছাধীন নয়।

ইলমুল গাইবে শিরক করার বিভিন্ন দিক রয়েছে:

(১) আল্লাহ ছাড়া কারো উপকরন ছাড়া কোনো বিশেষ বা সকল গাইবেরর জ্ঞান আছে বলে বিশ্বাস করা।

(২) ওহী বা আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনোভাবে কোনো গাইব বা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অদৃশ্য কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারে বলে বিশ্বাস করা। জ্যোতিষী, গণক, যাদুকর ও জিন্নদের বিষয়ে আরবের মুশরিকগণ এরূপ বিশ্বাস পোষণ করত।

(৩) আল্লাহর সকল ইলমু গাইব তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে জানিয়েছেন বলে বিশ্বাস করা। এতে কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা অস্বীকার করা হয়। কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টির সকল জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি সামান্য এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ গাইব জানে না। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারংবার বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের সময়, আগামীকাল মানুষ কি করবে, কোথায় মরবে ইত্যাদি কিছু বিষয় মহান আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। এজন্য কাউকে আল্লাহ এরূপ সকল ও সামগ্রিক গাইব জানিয়েছেন বলে দাবি করাও কুরআনের নির্দেশনা অস্বীকার করা বলে গণ্য। খৃস্টানগণ ঈসার (আঃ) বিষয়ে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে।

শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও সুন্নাহ

তাওহীদের দাও'আতই সকল নবী-রাসূল (আঃ)-এর মূল দাও'আত। বস্তুত শিরকই মানব সমাজের কঠিনতম পাপ যা মানুষের পারলৌকিক মুক্তির সকল আশা চিরতরে নস্যাত করে দেয়। এজন্য শয়তান সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে সকল মানুষকে এ কঠিন পাপের মধ্যে নিপতিত করতে। নবী-রাসূলগণের দাও'আতের মাধ্যমে যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হয়েছেন তাদেরকে এবং বিশেষকরে তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে তাদেরই নামে শিরকে লিপ্ত করেছে শয়তান। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইহূদী, খৃস্টান এবং আরবের মুশরিকগণ। এরা সকলেই নবী-রাসূলগণের হেদায়েত প্রাপ্ত মানুষদের উত্তরসূরী ও অনুসারী। যুগের পর যুগ এরা বংশ পরম্পরায় নবী-রাসূলগণের হেদায়াত বহন করেছেন এবং তাদের দীন পালন করেছেন। কিন্তু এরই মাঝে শয়তান এদের মধ্যে শিরক্-এর প্রচলন করতে সক্ষম হয়।

মহান আল্লাহর সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনীন শরীয়ত ও দাওয়াত হিসেবে ইসলামে শিরক প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর অন্যতম হলো মূল ওহীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং একে সর্বজনীন করা।

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের উম্মাতদের মধ্যে শিরক প্রবেশের মূল কারণগুলির অন্যতম ছিল (১) ওহী ভুলে যাওয়া বা ওহীর বিকৃতি ঘটা এবং (২) ওহীর পরিবর্তের মানুষদের মতামত, ব্যাখ্যা ও পছন্দকে বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা।

এ সকল মানুষ ওহীর ব্যাখ্যা ও দীনের নামে বিভিন্ন শিরক, কুফর ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলন করে এবং এগুলিকেই মূল তাওহীদ ও দীন বলে দাবি করে। মূল ওহী বিকৃত, বিলুপ্ত বা আংশিক বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এদের মতের অসারতা প্রমাণের পথ থাকে না। ফলে এদের মতামতই দীন বলে পরিগণিত হয়।

তবে মূল ওহী অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস সংরক্ষিত থাকার কারণে তাদের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয় নি।

তাওহীদের প্রচার ও শিরক অপনোদনই কুরআন-হাদীসের মূল আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, তাওহীদ ও শিরকই কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে কুরআন ও হাদীসে শিরক প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে (১) মুশরিকগণের পরিচিতি ও তাদের শিরকী বিশ্বাস ও কর্মগুলি উল্লেখ করা, যেন মুমিনরা কখনো সেগুলিতে লিপ্ত না হয়, (২) শিরকের কারণ ব্যাখ্যা করা, যেন মুমিনগণ এ বিষয়ে সতর্ক থাকেন, (৩) শিরকের অযৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা, (৪) শিরকের ভয়াবহ পরিণতি ব্যাখ্যা করা এবং (৫) শিরকের পথগুলি বন্ধ করা।

শিরকের উৎস-সমূহ বন্ধ করা

শিরক প্রতিরোধে কুরআন ও হাদীসের বিশেষ ব্যবস্থার অন্যতম শিরকের উৎসগুলি বন্ধ করা। আমরা দেখেছি যে, শিরক মূলত দুটি বিষয়কে নিয়ে আবর্তিত হয়: (১) মহান আল্লাহর প্রতি অব-ভক্তি বা কু-ধারণা এবং (২) বান্দার প্রতি অতিভক্তি বা অতি-ধারণা। আর এ দুটি বিষয় পরস্পরে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মহান আল্লাহর মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতি কু-ধারণা না হলে কেউ কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে কোনো বান্দার প্রতি অতি-ধারণা পোষণের অর্থই হলো মহান আল্লাহর মর্যদা ও ক্ষমতার প্রতি অব-ধারণা পোষণ করা।

কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে এ বিষয়গুলি রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ব্যাপক পরিসরের প্রয়োজন। এখানে অতি-সংক্ষেপে এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ করছি।

মহান আল্লাহর বিষয়ে অব-ধারণা রোধ করা

কুরআন ও হাদীসের প্রথম, প্রধান ও অন্যতম আলোচ্য বিষয় মহান আল্লাহর মর্যাদা, ক্ষমতা ও তাঁর তাওহীদ। বারংবার বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, একমাত্র প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, সকল কর্তৃত্বের অধিকারী, বিশ্ব পরিচালনার অধিকার, ক্ষমতা, কল্যাণ বা অকল্যাণের ক্ষমতা আর কারো নেই। কেউ কিছু করতে পারে না, দিতে পারে না। তিনি দিলে কেউ তা রোধ করতে পারে না। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে অন্য কারো কোনো ইচ্ছার কোনা মূল্য নেই। তিনি তাঁর নিজের ইচ্ছা, অনুমতি ও মর্যির বাইরে কারো সুপারিশ, শাফা‘আত বা দু‘আ গ্রহণ করেন না। একমাত্র তাঁকেই ডাক, তাঁরই সাহায্য চাও, তিনিই তোমার ডাকে সাড়া দিবেন। আর তিনি না দিলে অন্য কেউ কোনোভাবে দিতে পারে না। এভাবে কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর মহত্ব, মর্যাদা, ক্ষমতা ও শক্তি সম্পর্কে বারংবার ঘোষণা করা হয়েছে, যেন তাঁর মর্যদা ও মহত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস মুমিন অর্জন করতে পারে।

ফিরিশতাগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা

মুশরিকগণ যে সকল বান্দার বিষয়ে অতিভক্তির কারণে শিরক করেছে তাদের অন্যতম ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং আল্লাহর প্রিয় নেককার বান্দাগণ। এ ছাড়া মুশরিকগণ অনেক বানোয়াট বা কল্পিত ব্যক্তিত্বকে 'আল্লাহর প্রিয়' বা 'আল্লাহর সন্তান' নাম দিয়ে শিরক করেছে। আরবের কাফিরগণ ফিরিশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বা আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করত এবং তাদের সুপারিশ-শাফা'আত লাভের আশায় তাদের ইবাদত করত। কুরআন কারীমে তাদের এ অতিভক্তি রোধ করতে বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা মহান আল্লাহর সম্মানিত বান্দা মাত্র। তাঁরা শাফা'আতের সুযোগ পাবেন বটে, তবে তা তাদের ইচ্চাধীন নয়, বরং মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতির অধীন। কাজেই শাফা'আতের আশায় আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত ভয়ঙ্কর পথভ্রষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়।

নবী-রাসূলগণের বিষয়ে অতিভক্তি রোধ করা

ইহূদী, খৃস্টান ও আরবের মুশরিকগণ ইবরাহীম, ইসমাঈল, উযাইর, ঈসা (আলাইহিমুস সালাম) প্রমুখ নবী-রাসূলের বিষয়ে অতিভক্তি ও বাড়াবাড়ি করে শিরকে নিপতিত হয়। এজন্য কুরআন কারীমের বারংবার নবী-রাসূলগণের আবদিয়্যাত বা বান্দাত্ব, বাশারিয়্যাত বা মানবত্ব, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোনো অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর অক্ষমতা, গাইব সম্পর্কে অজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেন তাঁদের অনুসারী ও মুমিনগণ তাঁদের প্রতি অবিচল ভক্তি, ভালবাসা ও আনুগত্যের পাশাপাশি তাঁদের তাদের বিষয়ে অতিভক্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন।

ওলীগণ সম্পর্কে অতিভক্তি রোধ করা

নেককার বা ওলী-আল্লাহগণের বিষয়ে অতিভক্তি ছিল মুশরিকদের শিরকের অন্যতম কারণ। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে অতিভক্তির পথ রোধ করা হয়েছে:

প্রথমত, ঈমান ও তাকওয়াকে বেলায়াত বা ওলীত্বের ভিত্তি ধরা হয়েছে। ওলীর পরিচয়ের ক্ষেত্রে অলৌকিকতা, কারামাত ইত্যাদির কোনোরূপ গুরুত্ব প্রদান করা হয় নি। তাকওয়ার অধিকারী কোনো ব্যক্তি থেকে যদি কোনো অলৌকিক কার্য প্রকাশিত হয় তবে তা মহান আল্লাহর দেওয়া সম্মাননা বা কারামত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবে কারো অলৌকিক কার্য দেখে তাকে ওলী বলে মনে করার কোনোরূপ সুযোগ ইসলামে নেই। যেন মুমিন কারো অলৌকিক কর্ম দেখে তাকে নিশ্চিত ওলী বলে ধারণা না করে।

দ্বিতীয়ত, অলৌকিক কার্য দেখে তো কাউকে ওলী বলা যাবে না, এমনকি কুরআন-হাদীসে যাকে বেলায়াতের দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ঈমান ও তাকওয়া দেখেও কাউকে সুনিশ্চিত ওলী বলে নিশ্চিয়তা দেওয়া যায় না। কারণ, ‘ঈমান’ ও ‘তাকওয়া’ উভয়ই মূলত হৃদয়ের অভ্যন্তরের লূক্কয়িত বিষয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেন না। মুমিনের কর্ম তার ঈমান ও তাকওয়ার আলামত মাত্র, যা দেখে ঈমান ও তাকওয়ার বিদ্যমানতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়, তবে নিশ্চিত হওয়া যায় না। বাহ্যিক ঈমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে সকল মুমিনই আল্লাহর ওলী। যারা তাকওয়া ও নেক-আমল যত বেশি সে তত বেশি আল্লাহর প্রিয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে নির্ধারিতভাবে ওলী বলে চিহ্নিত করার সুযোগ দেওয়া হয় নি। নির্ধারিতভাবে কাউকে ‘ওলী’ বলে নিশ্চিত করা তো দূরের কথা, ওহীর নির্দেশানা বাইরে কাউকে নিশ্চিতরূপে জান্নাতী বলতেও আপত্তি করা হয়।

তাবেয়ীগণও সাহাবীগণের কাছে মাঝেমধ্যে দু‘আ চাইলে তাঁরা দু‘আ করতেন। এক ব্যক্তি আনাস (রা.) -এর কাছে এসে দু‘আ চায়। তিনি বলেন: “আল্লাহুম্মা আতিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ।” (অর্থাৎ: হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন।) ঐ ব্যক্তি বার বার দু‘আ চাইলে তিনি শুধু এতটুকুই বলেন।

অপরদিকে তাঁরা এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি বা অতিভক্তি নিষেধ করতেন। অনেক সময় অনেক সাহাবী দু'আ চাইলে দু'আ করতেন না, কারণ এতে মানুষ দু'আ চাওয়ার রীতি তৈরি করে নেবে। এক ব্যক্তি খলীফা উমরের (রা.) কাছে চিঠি লিখে দু'আ চায়। তিনি উত্তরে লিখেন :

إِنِّيْ لَسْتُ بِنَبِيٍّ، ولكن إذا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ لِذَنْبِكَ

"আমি নবী নই (যে তোমাদের জন্য দু'আ করব বা আমার দু'আ কবুল হবেই), বরং যখন সালাত কায়েম করা হবে, তখন তুমি তোমার গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে।"শাতেবী,আল ইতিসাম ১/৫০১.